ইলা মিত্রের জবানবন্দি

সম্পাদনা: শেখ রফিক

ইলা মিত্রের জবানবন্দি

ইলা মিত্রের জবানবন্দি

সম্পাদনা

শেখ রফিক

বিপ্লবীদের কথা
www.biplobiderkotha.com

ইলা মিত্রের জবানবন্দি

প্রকাশক
বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা
২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, মুক্তি ভবন নীচ তলা
(কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়) পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
সেল: ০১৭২৬-১২৩৫৫০
www.biplobiderkotha.com, rafiqcpb@gmail.com

স্বত্ব
বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

দ্বিতীয় সংস্করণ:
নভেম্বর ২০১৫
প্রচ্ছদ
মেহেদী বানু মিতা

মেকআপ
বিপ্লবীদের কথা

বর্ণ বিন্যাস
বিপ্লবীদের কথা

ছেপেছেন
চিত্রকল্প
১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরেরপুল, ঢাকা – ১০০০

বাঁধাই
রবিন অ্যান্ড ছোঁয়া বুক বাউন্ডিং, ২৪৫/এ ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-8675-41-2

মূল্য: একশত পঞ্চাশ টাকা

উৎসর্গ

তেভাগা আন্দোলনের বিপ্লবী ও সংগ্রামীদের স্মরণে

ও

প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

মালেকা বেগম

ইলাদি আপনি মৃত নন

ইলা মিত্রের মতো সংগ্রামী নেত্রী পৃথিবীতে খুব কম জন্মগ্রহণ করেন। ইলাদি মারা যাবে আর সবকিছু শেষ হয়ে যাবে– এটা আমি মানি না। বর্বর নির্যাতন-অত্যাচারের মধ্যে ইলা মিত্রের ত্যাগ আমাদের মধ্যে আলোর প্রদীপ জ্বালায়। নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে, ইলা মিত্রের সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

আমার ইলাদি সেই ১৯৫০-এর দশকের গোড়াতে সেখানে নির্যাতনকারী পাষণ্ডদের হাতে নির্যাতিত হতে হতে আসন্ন মৃত্যুর মুহূর্তেও যে বলেছিলেন: না, আমি মানুষের মহামুক্তির বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবো না, তখন কারাগারে আমাদের সকলের কাছে কারাগারের দুর্ভেদ্য দেয়াল ভেদ করেও সেই শপথের বাক্য আমাদের হৃদয়ে পৌঁছে সেই মহা অন্ধকারের মধ্যেও আলোর উদ্ভাসনে এবং জীবনের অপরাজেয় আশায় এবং স্বপ্নে অনুপ্রাণিত এবং উদ্দীপিত করে তুলেছিল।

এমন সংগ্রামী নেত্রী ও নেতা ইতিহাসে খুব কম আসেন। তাই প্রয়াত ইলা মিত্র আমাদের স্বপ্ন আশার এক বিরল প্রতীক। তাঁর সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস আমাদের জীবনের ইতিহাস, আমাদের জীবনের মহৎ ঐতিহ্যের ভাণ্ডার। সেই মহৎ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা, নতুন প্রজন্মের সংগ্রামী মানুষেরা: দেশ এবং কাল নির্বিশেষে বর্তমান মুহূর্তের পৃথিবীর সকল নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষেরা।

মহৎ ঐতিহ্যের এমন প্রতীকের মৃত্যু নেই। মৃত্যু থাকে না। সেই মহৎ ঐতিহ্যকে আমাদের ক্রমাধিকভাবে অনুসন্ধান করতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে এবং ঐতিহ্যের সেই সম্ভাবের অপরাজেয় শক্তির বোধে আমাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

ইলাদি আপনি মৃত নন, জীবিত। আপনার কাছে আমাদের জীবনের ঋণের শেষ নেই। আপনি আমাদের পাশে আছেন, আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের সংগ্রামের লাইনের একেবারে সম্মুখে আছেন। আমরা বলছি: জয়তু ইলা মিত্র।

জয়তু ইলা মিত্র
সরদার ফজলুল করিম

ইলা মিত্র এই বঙ্গের একটা উদাহরণ

বিনা ত্যাগে পার্টি হয় না, বিপ্লব করা যায় না। ইলা মিত্র সাড়ে ৩শ' বিঘা জমি পার্টি ও গরিব মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। পার্টির আহবানে সাড়া দিয়ে জমিদার বাড়ির সমস্ত সোনার গহনা পার্টিকে দান করেছিলেন। সমস্ত অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মকে সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন, ইলা মিত্রের ছিল অসীম সাহস, তাই কোনো বাধা, নির্যাতন তাঁকে দমাতে পারেনি।

ইলা মিত্র এই বঙ্গের একটা উদাহরণ আর এই উদাহরণ হচ্ছে না। এখান মেয়েরা অছে কিছু কিছু, কিন্তু এরকম ত্যাগী, সাহসী, আর দেখা যায় না। আমি তো অন্তত দেখি না। ইলাদি একেবারে সাধারণ জীবনযাপন করেছেন– বেশভূষা চালচলন খুবই সাধারণ ছিল। সাঁওতালদের প্রতি তাঁর যে ত্যাগ তা অতুলনীয়।

জয়তু ইলা মিত্র
জসিমউদ্দিন মণ্ডল

'মনে মনে একটা কথা আবৃত্তি করে চলেছিলাম, হে বীর সাথীরা আমার, তোমাদের কাছ থেকে এ শিক্ষা আমি আজি নিলাম, তা যেন আমার বেলায় কাজে লাগাতে পারি। আমার উপর অত্যাচার এই তো সবে শুরু হয়েছে। আমি জানি, এরপর বহু অত্যাচার আর লাঞ্ছনা আমার উপর নেমে আসবে। সেই অগ্নি-পরীক্ষার সময়, হে আমার বীর সাথীরা, আমি যেন তোমাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিঃশব্দে মুখ বুঝে থাকতে পারি। আর যদি মরতেই হয়, যেন অমনি নিঃশব্দে মরে যেতে পারি।'

... ইলা মিত্র

পড়াশুনার পাশাপাশি ইলা মিত্র খেলাধুলায়ও তুখোড় ছিলেন। ১৯৩৫-৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাজ্য জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ন। সাঁতার, বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন খেলায়ও তিনি ছিলেন বেশ পারদর্শী। তিনিই প্রথম বাঙালি মেয়ে যিনি ১৯৪০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত হন। যুদ্ধের জন্য অলিম্পিক বাতিল হয়ে যায়। খেলাধুলা ছাড়াও গান, অভিনয়সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।

ভূমিকা

ইলা মিত্র, নাচোলের রাণী মা; তেভাগা আন্দোলনের লড়াকু বিপ্লবী, সাঁওতালদের একান্ত আপনজন। তিনি গরিব-দুঃখী সাঁওতাল কৃষকদেরকে জোতদার, জমিদার ও মহাজনদের শাসন-শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য ইস্পাতদৃঢ় সংকল্প নিয়ে লড়াই করেছেন। সাঁওতালদের কাছে ইলা মিত্র ছিলেন মায়ের মতো, তাই তারা তাঁকে রাণী মা বলে ডাকতেন।

কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ বলতে সাঁওতালরা রাণী মা'কেই বুঝতেন। তাদের সকল সুখ-দুঃখ রাণী মা'র সাথে ভাগাভাগি করে নিতেন। আর রাণী মা-ও তাদেরকে নিজের সন্তানের মতো ভালবাসতেন। সাঁওতালরা এবং রাণী মা ছিলেন অবিচ্ছেদ্য।

নাচোলের তেভাগা আন্দোলন ও ইলা মিত্র একই সূত্রে গাঁথা। শুধু তাই নয়, ভারত ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি জীবনবাজী রেখে লড়েছেন। তাঁর সেই সংগ্রামময় জীবন ও তেভাগা লড়াই-সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি তাঁরই জবানবন্দি, সাক্ষাৎকার ও লেখনীতে ফুটে উঠেছে। ইলা মিত্রের এসব জবানবন্দি, সাক্ষাৎকার ও লেখনী নিয়ে 'ইলা মিত্রের জবানবন্দি' নামে বইটি সাজানো হয়েছে।

'ইলা মিত্রের জবানবন্দি' বইয়ের লেখাগুলো সত্যেন সেনের 'বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম' ও মালেকা বেগমের 'ইলা মিত্র' এবং মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তীর 'নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ, সমকালীন রাজনীতি ও ইলা মিত্র' বই এবং সাপ্তাহিক একতা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বানানরীতি লেখকদের লেখা অনুসারে রাখা হয়েছে। সতর্কতা সত্ত্বেও এই বইতে মুদ্রণজনিত কোনো ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তার জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। সচেতন পাঠক কোনো ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

শেখ রফিক
নভেম্বর ২০১৫
বিপ্লবীদের কথা, মুক্তি ভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা

সূচি

গ্রেপ্তার হওয়ার পর পাষণ্ড অত্যাচার প্রসঙ্গে
ইলা মিত্রের জবানবন্দি ১৩

আদালতে ইলা মিত্রের জবানবন্দি ১৬

ইলা মিত্র ও স্টিফেন মাদ্রির কথিত জবানবন্দি ১৯
* ইলা মিত্রের জবানবন্দি
* স্টিফেন মাদ্রির জবানবন্দি ২৩
* কথিত জবানবন্দি প্রসঙ্গে স্টিফেন মাদ্রির বক্তব্য ২৬

সারাবিশ্বে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম সফল হবেই: ইলা মিত্র ২৭

ইলা মিত্রের সাক্ষাৎকার ২৯

তেভাগা সংগ্রামের ৫০ বছর পূর্তিতে
ইলা মিত্রের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য ৩৩

আমার জানা পূর্ব বাংলা ৩৯

পূর্ব বাংলা আজও আমার তীর্থভূমি ৪৩

শহিদ দিবস ও গণ-আন্দোলন ৪৮

ইলা মিত্রের চিঠি ৫৪

পরিশিষ্ট–১: বিপ্লবী ইলা মিত্র ৫৯

পরিশিষ্ট–২: Comrade Ila Mitra ৬৪

গ্রেপ্তার হওয়ার পর পাষণ্ড অত্যাচার প্রসঙ্গে

ইলা মিত্রের জবানবন্দি

ওরা প্রথম থেকেই নির্দয় ভাবে মারতে শুরু করলো। শুধু আমাকে নয়, আমাদের সবাইকেই। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে এল নাচোলে। আমি মারপিটের ফলে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, আমার সর্বাঙ্গে বেদনা। ওরা আমাকে একটা ঘরের বারান্দায় বসিয়ে রাখলো। আমাদের সঙ্গে যে সকল সাঁওতাল কর্মীরা ছিল, আমার চোখের সামনে তাদের সবাইকে জড় করে তাদের উপর বর্বরের মতো মারপিট করে চললো। আমি যাতে নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখতে পাই, সেজন্যই আমাকে তাদের সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল।

ওরা তাদের মারতে মারতে একটা কথাই বার বার বলছিল, আমরা তোদের মুখ থেকে এই একটা কথাই শুনতে চাই, বল, ইলা মিত্র নিজেই পুলিশদের হত্যা করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল।

এই কথাটুকু বললেই তোদের ছেড়ে দেব। কিন্তু যতক্ষণ না বলবি, এই মার চলতেই থাকবে। মারতে মারতে মেরে ফেলব, তার আগে আমরা থামব না।

কথাটা তারা যে শুধু ভয় দেখাবার জন্য বলছিল, তা নয়, তারা মুখে যা বলছিল, কাজেও তাই করছিল। ও সে কি দৃশ্য! আর সেই দৃশ্য আমাকে চোখ মেলে দেখতে হচ্ছিল। এ কি শাস্তি! কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই হিংস্র পশুর দল আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। রক্তে ওদের গা ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু কারু মুখে কোনো শব্দ নাই, একটু কাতরোক্তি পর্যন্ত না।

> ওরা নিঃশব্দ হয়ে ছিল, কিন্তু দেখতে দেখতে কেঁদে ফেললাম আমি। এই দৃশ্য আমি আর সইতে পারছিলাম না। মনে মনে কামনা করেছিলাম, আমি যেন অজ্ঞান হয়ে যাই। কিন্তু তা হল না, আমাকে সজ্ঞান অবস্থাতেই সব কিছু দেখতে হচ্ছিল, কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, এত দুঃখের মধ্যেও আমাদের এই বীর কমরেডদের জন্য গর্বে ও গৌরবে আমার বুক ভরে উঠেছিল। একজন নয়, দু'জন নয়, প্রতিটি মানুষ মুখ বুজে নিঃশব্দ হয়ে আছে, এত মার মেরেও ওরা তাদের মুখ খোলাতে পারছে না। এমন কি করে হয়! এমন যে হতে পারতো এ তো আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

মনে মনে একটা কথা আবৃত্তি করে চলেছিলাম, হে বীর সাথীরা আমার, তোমাদের কাছ থেকে যে শিক্ষা আমি আজ নিলাম, তা যেন আমার বেলায় কাজে লাগাতে পারি। আমার উপর অত্যাচার এই তো সবে শুরু হয়েছে। আমি জানি, এরপর বহু অত্যাচার আর লাঞ্ছনা আমার উপর নেমে আসবে। সেই অগ্নি-পরীক্ষার সময়, হে আমার বীর সাথীরা, আমি যেন তোমাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিঃশব্দে মুখ বুজে থাকতে পারি। আর যদি মরতেই হয়, যেন অমনি নিঃশব্দে মরে যেতে পারি।

প্রচণ্ড তর্জন গর্জনের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম, চেয়ে দেখি, হরেককে দলের মধ্য থেকে মারতে মারতে বার করে নিয়ে আসছে। ওদের মুখে সেই একই প্রশ্ন, বল, ইলা মিত্র সে-ই পুলিশদের হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিল। না বললে মেরে ফেলব, একদম মেরে ফেলব। আমি চেয়ে আছি হরেকের মুখের দিকে। অদ্ভুত ভাববিকারহীন একখানি মুখ। অর্থহীন দৃষ্টিতে শূন্যপানে তাকিয়ে আছে। ওদের এত সব কথা যেন তার কানেই যাচ্ছে না। ক্ষেপে উঠল ওরা। কয়েক জন মিলে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। তারপর ওরা ওদের মিলিটারি বুট দিয়ে তার পেটে বুকে সজোরে লাথি মেরে চলল।

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, হরেকের মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তারপর তার উপর ওরা আরও কতক্ষণ দাপাদাপি করল। একটু বাদেই এক খণ্ড কাঠের মত স্থির হয়ে পড়ে রইল হরেক। ওদের মধ্যে একজন তাকে নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, ছেড়ে দাও, ওর হয়ে গেছে। এই বলে ওরা আর এক জনকে নিয়ে পড়লো।

মরে গেছে। আমাদের ছেড়ে চলে গেছে হরেক। অনেক দিন আগেকার পুরানো একটা কথা মনে পড়ে গেল। একদিন হরেককে পার্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজের সময় তার দেখা মেলেনি। এজন্য কৈফিয়ত চাইলে পরে সে বলেছিল, তার গরুটা হারিয়ে যাওয়ায় সে তাকে খোঁজ করতে বেরিয়েছিল। সেই জন্যই সে সময় মত উপস্থিত থাকতে পারেনি। এজন্য অনেকের সামনে তাকে তিরস্কার শুনতে হয়েছিল। তারপর থেকে তার উপর কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হতো না। এটা বুঝতে পেরেছিল হরেক। এই নিয়ে সে এক দিন অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিল, আমাকে কি মনে করেন আপনারা?

> জানেন, প্রয়োজন হলে পার্টির জন্য আমি জীবন দিতে পারি? এই ধরনের বাগাড়ম্বর অনেকেই করে। তার এই কথায় কেউ ততটা আমল দেয়নি। কিন্তু আজ? আজ হরেক তার জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে গেল, সেদিন সে যা বলেছিল, তা বাগাড়ম্বর নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আমাদের ছেড়ে চলে গেছে হরেক। আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। একটু আগেই আমি কেঁদেছিলাম। কিন্তু এখন আমার সমস্ত কান্না শুকিয়ে গেছে। তার পরিবর্তে ভিতর থেকে প্রচণ্ড একটা জিদ মাথা তুলে জেগে উঠছে। আমার মন বলে চলেছে, মারুক, মারুক, ওরা আমাকেও এমনি করে মারুক। আর মনে হচ্ছে, এই যে আমাদের কয়েক শ' সাথী, এদের মধ্যে কাউকে দিয়ে ওরা কথা বলাতে পারবে না। কিছুতেই না। ওদের হার হয়েছে। ওদের হার মানতে হবে।

তথ্যসূত্র: বইয়ের নাম: বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন, লেখক: সত্যেন সেন, পৃষ্ঠা: ১০৬–১০৯, প্রকাশক: এম. এ. আলীম, কালিকলম প্রকাশনী, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০।

পাদটীকা:

নাচোলে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর ইলা মিত্র তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে যে নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন তা এই জবানবন্দিতে প্রকাশ পেয়েছে। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সত্যেন সেন ইলা মিত্রের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় ইলা মিত্র উপরের জবানবন্দিটি দেন।

আদালতে ইলা মিত্রের জবানবন্দি-১৯৫০

কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

বিগত ৭-১-৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেপ্তার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোলে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধোর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সব কিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস. আই আমাকে হুমকি দেখায়।

আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দি করে রাখে।

> 'আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধ্যেবেলাতে এস, আই-এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময়ে আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এরপর আমার কাপড়-চোপড় আমাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবত এস. আই-এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম না।'

'যে কামরাটিতে আমায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো। দু'টো লাঠির মধ্যে আমার পা দু'টি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল এবং সে সময়ে চারিধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা বলছিলো যে আমাকে 'পাকিস্তানী ইনজেকশন' দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময়ে তারা একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিলো। জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে ফেলেছিলো। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিলো না।'

> 'সেলের মধ্যে আবার এস. আই সেপাইদেরকে চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিয়ে দিলো এবং বললো', 'এবার সে কথা বলবে।' তারপর চার-পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চীৎ করে শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌন অঙ্গের মধ্যে একটা গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।'

'৯-১-৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত এস. আই এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুটে করে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো। এরপর আমার ডান পায়ের গোড়ালীতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময়ে আধা অচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস. আইকে বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম: আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস. আই এবং সিপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিলো। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজী হলাম না তখন তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করলো। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।'

'পরদিন ১০-১-৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে, আর আমার কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হলো। নবাবগঞ্জ জেলে গেটের সিপাইরা জোর ঘুঁষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো।'

'সে সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম। কাজেই কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন সিপাই আমাকে একটি সেলের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেলো। তখনো আমার রক্তপাত হচ্ছিল এবং খুব বেশি জ্বর ছিলো। সম্ভবত নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিলেন ১০৫ ডিগ্রী। যখন তিনি আমার কাছে আমার দারুণ রক্তপাতের কথা শুনলেন তখন তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হবে। আমাকে কিছু ওষুধ এবং কয়েক টুকরো কম্বলও দেওয়া হলো।'

'১১-১-৫০ তারিখে সরকারী হাসপাতালের নার্স আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট

দিয়েছিলেন সেটা জানি না। তিনি আসার পর আমার পরনে যে রক্তমাখা কাপড় ছিল সেটা পরিবর্তন করে একটা পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হলো। এই পুরো সময়টা আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার শরীরে খুব বেশি জ্বর ছিল, তখন আমার দারুণ রক্তপাত হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।'

'১৬-১-৫০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমার সেলে একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসা হল এবং আমাকে বলা হল যে পরীক্ষার জন্যে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশি শরীর খারাপ থাকার জন্যে আমার নড়াচড়া সম্ভব নয় একথা বলায় লাঠি দিয়ে আমাকে একটা বাড়ি মারা হলো এবং স্ট্রেচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এরপর আমাকে অন্য এক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি সেখানে কিছুই বলিনি, কিন্তু সেপাইরা জোর করে একটা সাদা কাগজে আমার সই আদায় করলো। তখন আমি আধা অচেতন অবস্থায় খুব বেশি জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিল সে জন্যে পরদিন আমাকে নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে পাঠানো হলো। এরপর যখন আমার শরীরের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হলো তখন আমাকে ২১-১-৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানে জেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হলো।'

'কোনো অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলিনি এবং উপরে যা বলেছি তার বেশি আমার আর বলার কিছু নেই।'

তথ্যসূত্র: বইয়ের নাম: বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন, লেখক: সত্যেন সেন, পৃষ্ঠা: ১১২–১১৬ প্রকাশক: এম. এ. আলীম, কালিকলম প্রকাশনী, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০।

ইলা মিত্র ও স্টিফেন মাদ্রির কথিত জবানবন্দি

ইলা মিত্রের জবানবন্দি (১৬-১-৫০)

আমি ১৯৪৪ সাল Women College Calcutta হইতে বি. এ. পরীক্ষা পাশ করিয়াছি এবং ঐ বৎসর শেষ দিকে রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পর হইতে আমি রামচন্দ্রপুরে আমার স্বামীর বাড়িতে ছিলাম এবং মাঝে মাঝে কলিকাতা গিয়েছিলাম। আমার স্বামী একজন কমিউনিস্ট। গত ২/৫/৪৯ তারিখে আমার স্বামীকে ধরার জন্য রামচন্দ্রপুরে পুলিশ আমাদের বাড়িতে আসে। ঐদিন আমার স্বামী বাড়ি ছিলেন না। অপর দুইজন কমিউনিস্ট সিতা মৈত্রও আমাদের বাড়িতে ছিলেন। এবং পুলিশ তাহাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করেন। অপর একজন আতাউর রহমানকেও পুলিশ ঐদিন আমাদের গ্রাম হইতে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ আমাদের বাড়ি হইতে কতগুলো চিঠিপত্র ও Communist Literature Seige করে। এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করিলে আমাদের বাড়ির সামনে আমাদের গ্রামের প্রায় ৪/৫ শত লোক সমবেত হয়। পুলিশ চলিয়া যাওয়ার পর আমি এ সকল লোক লইয়া একটি মিটিং করি এবং উক্ত মিটিং-এ Communism সর্ম্পকে বক্তৃতা দিই। মিটিং এর শেষে ঐ সকল লোক লইয়া একটি শোভাযাত্রা করি এবং কমিউনিস্ট Slogan বলি। সেইদিন হইতে আমি কমিউনিস্ট হই এবং কাজে নামি। ইহার পর জানিলাম যে পুলিশ শীঘ্র আমাকে গ্রেপ্তার করিবে। তখন আমি আমার এক বছরের ছেলেকে লইয়া কলিকাতায় যাই এবং সেখানে ২ মাস থাকার পর রামচন্দ্রপুরে ফিরিয়া আসিয়া আমার ছেলেকে আমার শাশুড়ীর নিকট রাখিয়া এ বাড়ি ও বাড়ি থাকি এবং মধ্যে মধ্যে কমিউনিস্ট সম্বন্ধে সভা করিয়া বক্তৃতা দিই। গত ১০/১০/৪৯ তারিখে পুলিশ আমাদের ধরার জন্য আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে। আমি অন্য বাড়িতে থাকায় পুলিশ আমাকে ধরিতে পারে নাই। ঐ দিন পুলিশ রামচন্দ্রপুরে ওয়াজেদ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে।

আমি ঐ দিন নকুল রায়কে সঙ্গে করিয়া চণ্ডীপুরে মাতলা মাঝির বাড়িতে যাই। চণ্ডীপুরে একটি কমিউনিস্ট আড্ডা আছে এবং আমার স্বামী চণ্ডীপুরে ছিলেন না। তিনি আমাকে বলিলেন যে গত ৬/১০/৪৯ তারিখে তাহারা সাঁওতাল ও অন্যান্য লোক লইয়া জগদলে একটা কমিউনিস্ট সম্বন্ধে মিটিং করিয়াছে। তিনি আরো বলিলেন যে কোন সময় পুলিশ সেখানে আসিতে পারে।

ইহা শুনিয়া আমি ঐ দিন কলকাতা যাই। আমার শরীরও কিছু অসুস্থ ছিল। আমি কলিকাতায় দেড়-দুই মাস থাকি এবং মাতলা মাঝির বাড়িতে আমার স্বামী, বৃন্দাবন

সাহা, অনিমেষ লাহিড়ী alias সাগর, আজাহার alias পণ্টু, শিব প্রামাণিক alias বিষ্টুদাকে দেখি।

আমি ঐ দিন মাতলা মাঝির বাড়িতে 'সাত আড়ি জিন', তেভাগা সম্বন্ধে একটা ঘরোয়া মিটিং করি। ইহার পর হইতে আমি, আমার স্বামী, বৃন্দাবন, অনিমেষ আজাহার ও বিষ্টুদা গ্রামে গ্রামে যাইয়া সাত আড়ি জিন, তেভাগা সম্বন্ধে মিটিং করি।

আমরা চণ্ডীপুর, মল্লিকপুর, পলাশকান্দর-ধরমপুর, নাপিতবাড়ি, ধবলশ্যামপুর, কেন্দুয়া, জগদল, ঘিওন, ঘাসুড়া তেলেঙ্গাপাড়া, পালানপাড়া, বিষপুকুরিয়া, বিলাসপুর প্রভৃতি জায়গায় Communist সম্বন্ধে প্রচার কার্য করি। উক্ত কাজের জন্য ঐ সকল গ্রামের প্রত্যেকটিতে লোকাল Volunteer নিযুক্ত করা হয়। চণ্ডীপুর গ্রামে মাতলা মাঝির বাড়িতে আমাদের প্রধান আড্ডা। ঐ সকল গ্রাম হইতে প্রত্যেক রাত্রিতে প্রত্যেক গ্রাম হইতে ২জন করিয়া Volunteer মাতলা মাঝির বাড়িতে পাহারা দেওয়ার জন্য আসিত এবং তীর ধনুক লইয়া পাহারা দিত। চণ্ডীপুরের হরমা মাঝি, তারাপদ, ভগীরথ, মাতলা মাঝি, পলাশকান্দারের হরেক ও ঝড়ু, নাপিত পাড়ার উদয় ও চুরকা, কেন্দুয়ার সোনা ও চুনু, রায়তারার মায়াঙ্গ, বিষপুকুরের জয় চান্দ ও মেঘু, জগদলের ভুলু, ধরম-শ্যামপুরের বেনীরায় ও বিষ্ণু রায়, তেলেঙ্গা পাড়ার শঙ্কর এবং অন্যান্য Volunteer দিগের মধ্যে প্রধান ছিল। গত ২০/১২/৪৯ তারিখে আমি, অনিমেষ, আজাহার, বিষ্টুদা, বৃন্দাবন ও প্রায় ২ শত সাঁওতাল ও অন্যান্যদের লইয়া ঘেসুড়া গ্রামের ঝড়ু বারিন ও চামুর বাড়ি ঘেরাও করি এবং পুলিশ আসার জন্য উহাদিগকে যথাক্রমে ১০০, ১০০ ও ৩০ টাকা জরিমানা করিয়া এবং তখনই ঐ পরিমাণ টাকা আদায় করি এবং তেভাগা ও সাত আড়ি মানিয়া লইল বলিয়া উহাদের নিকট লিখাইয়া লইল। সাঁওতাল ও অন্যান্য সকলের সহিত লাঠি ছিল। পরের দিন আমরা আবার নিলামপুরের বাড়িন্দা মণ্ডলের বাড়িতে গিয়া পুলিশে খবর দিয়াছে এই অপরাধে তাহাকে ৪০ টাকা জরিমানা করি ও তাহা আদায় করি। চাঁদা আদায়ের জন্য Volunteer গণকে রসিদ দেওয়া হইয়া ছিল এবং আমি ও অন্যান্য সকলে তাহাদিগকে চাঁদা আদায় করিতে নির্দেশ দিয়াছিলাম।

আমার স্বামী, বিষ্টুদা, অনিমেষ, আজাহার এবং অন্যান্য পার্টির মেম্বারগণের নির্দেশমত Volunteer গণ রাঙ্গামিয়া, চরণমাঝি ও এছানমিয়ার খৈলানের ধান লুট করে। কারণ এই সকল ব্যক্তি তেভাগা ও সাত আড়ি জিন মানিয়া লয় নাই। গত ৪/১/৫০ তারিখে আমি বিষ্টুদা ও জোতদারদের নিকট হইতে লিখাইয়া লইল যে তাহারা সাত আড়ি জিন ও তেভাগা মানিয়া লইবে। আজাহার প্রত্যেক দিন সকালবেলা Volunteer গণকে Parade শিক্ষা দিত এবং সাঁওতালগণ প্রত্যেকে তীর ধনুক দ্বারা সজ্জিত ছিল। আমাদের জন্য কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। আমাদের পার্টির প্রোগ্রাম ছিল যে পুলিশ পাইলে তাহাদের বন্দুক কাড়িয়া লইতে হইবে, কিন্তু অন্যান্য বন্দুকওয়ালাগণের বাড়ি একই সময়ে চড়াও হইয়া বন্দুক কাড়িয়া লইতে হইবে।

আমাদের পার্টির মিটিং ও অন্যান্য যে কোনো কার্যে লোকজন সমবেত করিবার জন্য নাকাড়া (ঢোল) বাজান হইতো। গত ৫/১/৫০ তারিখে আমি, অনিমেষ, আজাহার, বিষ্টুদা, বৃন্দাবন ও আমার স্বামী সকলে চণ্ডীপুর মাতলা মাঝির বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। সকালবেলা সংবাদ পাওয়া গেল যে জাগদল গ্রামের একজন হিন্দুস্থানবাসীর ২০ মণ ধান পুলিশ ঝবরুব করিতে আসিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া অনিমেষ জাগদলে যায়, লোকজনসহ গাড়ি করিয়া ঐ ২০ মণ ধান মাতলা মাঝির বাড়িতে লইয়া আসে, তখন বেলা ১০টা হইবে। এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে ঘেসুড়া গ্রামে দারোগা ও পুলিশ কনস্টেবল আসিয়াছে। এই সময় আমার স্বামী আমাকে ও আজহারকে উক্ত ধানের পাহারায় থাকিতে বলিয়া অনুমান ৩০/৪০ গজ দূরে একটা আমগাছের ধারে মাতলা মাঝিকে সঙ্গে করিয়া নাকড়া বাজাইতে লাগিলেন এবং অনিমেষ, বৃন্দাবন দৌড়াইয়া ঘেপুরা গ্রামে গেল। আমার স্বামী নাকাড়া পিটিতে বহু লোকজনকে বলিতে লাগিলেন যে পুলিশ আসিয়াছে, ঘেসুড়া যাও। এই কথায় সাঁওতাল ও অন্যান্য লোক তীর ধনুক, লাঠি ও বল্লম লইয়া ঘেসুড়ার দিকে গেল। এমন সময় Procurement Department-এর একজন অফিসার একজন বয়স্ক লোক লইয়া চণ্ডীপুরে আসে। আমার স্বামী তাহাদের সহিত কি কথা বলিলেন ও আমাকে এবং আজাহারকে বলিলেন যে ঐ ২টি লোককে যাইতে দিবে না। লোক দুইটি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য আমাকে ও আজাহারকে বার বার অনুরোধ করে। কিন্তু আমরা ছাড়িয়া দেই নাই। এমন সময় অনিমেষ, বৃন্দাবন, সাঁওতাল ও অন্যান্য লোকসহ ঘেসুড়ার দিক হইতে তারা রাইফেল ও একটা বন্দুকসহ মাতলা মাঝির বাড়িতে ফিরিয়া আসিল ও বন্দুক ও রাইফেল মাতলা মাঝির বাড়িতে রাখা হইল। বৃন্দাবনের কাপড়ে রক্ত মাখা ছিল। উহা দেখিয়া আমি বলিলাম, কমরেড আপনার কাপড়ে রক্ত কেন? সে বলিল, না আমাকে কেহ মারে নাই উহারাই শেষ হইয়াছে। আমি আবার প্রশ্ন করিলাম, একেবারেই কি শেষ হইয়াছে? উহাতে সে বলিল না একেবারেই শেষ হয় নাই। আমরা রমেন মিত্র ও মাতলা মাঝির নিকট হইতে উপদেশ লইতে আসিয়াছি যে উহাদেরকে একেবারেই শেষ করিতে হইবে কিনা। ইহার পর আমার স্বামী অনিমেষ ও অন্যান্য সকলে ঘেসুড়ার দিকে চলিয়া গেল। কেবল আমি, আজাহার ও বৃন্দাবন সেখানে রহিলাম। বৃন্দাবন তাহার কাপড়ের রক্তে ধুইতে লাগিল। বেলা অনুমান ৪টার সময় আমার স্বামী ও অন্যান্য লোকজন রাইফেলের গুলি ও হেলমেট লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন যে দারোগা ও পুলিশদের পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার স্বামী Procurement-এর Office-কে ও তাহার সঙ্গের লোকটিকে ভগীরথের ঘরে বন্দি করিয়া আনিয়াছে। ইহাদিগকে মারিয়া ফেলা হইবে। সন্ধ্যার পর আমার স্বামী, অনিমেষ, বৃন্দাবন, আজাহার প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে আমাকে রাত্রিতে বৃন্দাবনকে লইয়া পলাশকান্দায় থাকিতে হইবে এবং সেখান হইতে পরদিন সকালবেলা আমি ধবল শ্যামপুর যাইব। আমি কাগজপত্রসহ ঐ রাত্রিতে পলাশকান্দারে হরেকের বাড়ি গিয়া থাকি।

পর দিন সকালবেলা আমরা চণ্ডীপুরের দিকে ডুগডুগির আওয়াজ শুনিতে পাইলাম এবং জানিলাম যে পুলিশ আসিয়া গুলি আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমি ও বৃন্দাবন পলাশকান্দারের লোকজন একত্রিত করিয়া চণ্ডীপুরের দিকে যাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু লোকজন সব পলাইতে লাগল। তখন আমি ও বৃন্দাবন ৭/৮ জন লোকসহ চণ্ডীপুরের দিকে অগ্রসর হই। কিন্তু চণ্ডীপুর হইতে লোকজন পলাইয়া যাইতে দেখিয়া আমরা ঘেসুড়ার দিকে গেলাম এবং এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরিয়া কোন লোক না পাইয়া বেলা অনুমান ৩টার সময় পলাশকান্দার হরেকের বাড়িতে গেলাম। সেখানে মাতলা মাঝির সহিত দেখা হয়। সে বলিল তাহার সাঁওতালরা পলাইয়া গিয়াছে এবং সেও মূলডাঙ্গায় চলিয়া যাইবে। এই বলিয়া মাতলা চলিয়া গেল। পরে মাতলার ভাই মোসা আসিল এবং তাহার নিকট শুনিলাম যে পুলিশ আবার গুলি চালাইয়াছে। তখন পলাশকান্দারের লোকজন পলাইতে লাগিল। তখন আমি আমার সহিত থাকা আমাদের পার্টির কিছু কাগজপত্র ও বই হরেকের বাড়ির নিকট একটা ভাঙ্গা দালানে ইটের নীচে রাখিয়া দিয়া মোসা ও বৃন্দাবনকে সঙ্গে লইয়া মূলডাঙ্গায় রাত্রি প্রায় ৮টায় পৌঁছিলাম। পরদিন সকালে সূর্যমাঝি আমাদিগকে বিষুকেতুর গ্রাম পর্যন্ত আগাইয়া দেয়। এবং সেখান হইতে রহনপুর যাইতে বলে। আমি ও বৃন্দাবন ভোরে রহনপুর রওনা দেই এবং বেলা অনুমান ১০টার সময় পৌঁছি। এবং সেখানে আমাকে ও বৃন্দাবনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্বাক্ষর
ইলা মিত্র
১৬/১/৫০

স্বাক্ষর
ক. Ahmed
১০/১/৫০
ম্যাজিস্ট্রেট
(বশির উদ্দিন আহমেদ)

স্টিফেন মাদ্রির জবানবন্দি

গত ২/৩ মাস ধরে হাবু বাবু তাঁর স্ত্রী ইলা, বৃন্দাবন এবং অন্যান্য কমিউনিস্টরা কুসুমডাঙ্গা, তাকাহর, চণ্ডীপুর, ধুলাচর এবং অন্যান্য গ্রামে মিটিং আহবান করে আসছিলেন। আমি এসব মিটিং এ উপস্থিত হতাম। হাবু বাবু তাঁর স্ত্রী ইলা, বৃন্দাবন এবং অন্যান্যরা সাত আড়ি জিন, তেভাগা, No tax campaign, জমিদারদের কর না দেয়া ন্যায্য মূল্যে ধান না দেয়া, সরকারকে কোনো বিষয়ে সাহায্য না করা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। তাঁরা বলতেন যেখানেই পুলিশ দেখা যাক না কেন তাদেরকে মেরে ফেলা হবে এবং তাদের বন্দুক ছিনিয়ে নেয়া হবে। তাঁরা চরণ মাঝিকে সাত আড়ি জিন উপেক্ষা করতে দেখে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। তাঁরা গোবরাতলায় এক ঠাকুরের ধান লুট করেছিল এবং আমিও লুটের সময় ছিলাম। চণ্ডীপুরে মাতলা মাঝির বাড়ি ছিল প্রধান কেন্দ্র। প্রতি গ্রাম থেকে ২ অথবা ৪ জন ভলান্টিয়ার আসত মাতলার বাড়িতে এবং রাতে তার বাড়ি পাহারা দিত। এক রাতে আমিও মাতলা বাড়িতে পাহারায় ছিলাম। আজাহারও এই দলের একজন সদস্য ছিল। সে সকাল ও রাত আমাদেরকে প্যারেড করার প্রশিক্ষণ দিত। মাতলা মাঝি, নিমাই, চান্দুমাঝি, হারান মাঝি, তারাচাঁদ, ভগীরথ, বেণী রায় এবং অন্যান্যরা ছিল ভলান্টিয়ারদের মধ্যে প্রধান।

বৃহস্পতিবারের আগের বৃহস্পতিবারে ডুগডুগি বাজিয়ে মিটিং ডাকা হয়েছিল। সকাল প্রায় ৮ অথবা ৯টার দিকে আমাদের স্বজাতি এক স্ত্রীলোক মাতলা মাঝির বাড়িতে এসে খবর দেয় যে, ঘাসুড়া গ্রামে পুলিশ ও দারোগা এসেছে। আমি সেই সময় মাতলা মাঝির বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। খবর পেয়ে হাবু ঢোলে বাড়ি দিলে অনেক লোক ডুগডুগির শব্দ শুনতে লাঠি, তীর ধনুক নিয়ে মাতলা মাঝির বাড়ির কাছে আসে। তখন ইলা দেবী বলেন, 'চল আমরা লোকজন নিয়ে ঘাসুড়ায় যাই।' হাবু বাবু, ইলা দেবী এবং বৃন্দাবন সামনের দিকে চলতে থাকে। আমিও তাঁদের সাথে ঘাসুড়ায় যাই। আমরা সেখানে উপস্থিত হলে দারোগা ও পুলিশেরা বন্দুক তুলে নেয়, তখন ইলা দেবী দারোগাকে বলেন, 'বন্দুক সরিয়ে রাখুন, আপনার সাথে আমাদের কথা আছে।' এ কথা শুনে দারোগা এবং কনস্টেবল তিন জন তাদের বন্দুক পাশে সরিয়ে রাখে। ইলা মিত্র তার সাথে কথা বলে এবং অন্যান্যদেরকে ইশারা করেন। মাতলা মাঝি, হাবু বাবু, বৃন্দাবন এবং নিমাই তাদের কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেন এবং হাবু বাবু ও বৃন্দাবন বন্দুক দিয়ে দারোগাকে মারতে শুরু করেন যুগপৎ অন্যান্যরা দারোগা ও কনস্টেবলদেরকে মারতে শুরু করে। মাতলা মাঝি, নিমাই পরাগ, হরেক, দুখু মাঝি এবং অন্যান্য অনেক দারোগা ও পুলিশরাও গুরুতরভাবে আহত হয়। দারোগা দৌড়ে গিয়ে এক বিধবার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। হাবু বাবু, মাতলা মাঝি, বৃন্দাবন এবং অন্যান্য টেনে হিঁচড়ে দারোগাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসে।

দারোগা ও তিন জন কনস্টেবলকে নিয়ে আসে। দুটি গরুর গাড়ির একটা ছিল নাচোলের যেটিতে করে দারোগা এসেছিল, আর অন্য গাড়ি ছিল আমার। আমি পুলিশদেরকে কবরস্থানে নেবার জন্য গাড়িটা দিয়েছিলাম। ইলা মিত্র, হাবু বাবু, বৃন্দাবন, মাতলা মাঝি ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিবর্গ বলে যে, পুলিশদেরকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেয়া হবে। হরেক বৃন্দাবন, মাতলা মাঝি এবং আমি ও অন্যান্যরাসহ পুরোপুরি ২০ বা ২৫ জন কবরস্থানে পৌঁছল তখন একজন কনস্টেবল গাড়ি থেকে দৌড়ে পালায়। মাতলা মাঝির ভাই ও অন্যান্য কয়েকজন তার পিছনে ধাওয়া করে। বৃন্দাবন দারোগা ও কনস্টেবলদেরকে ডাকে এবং কবরে নামতে বলে। এই সময় দারোগা তার জীবন ভিক্ষা চায় এবং পানি খেতে চায়। বৃন্দাবন তখন পানি দেবার পরিবর্তে তার মুখে প্রস্রাব করে। তারপর হাবু বাবু, বৃন্দাবন এবং মাতলা মাঝি দারোগাকে কবরের মধ্যে নামিয়ে দেয়। হরেক, বৃন্দাবন এবং মাতলা মাঝি অন্য কনস্টেবল দুজনকে জোর পূর্বক কবরে নামিয়ে দেয়।

কনস্টেবলরা বৃন্দাবন, মাতলা মাঝি এবং হরেককে প্রথমে তাদেরকে মেরে তারপরে কবর দেবার অনুরোধ করে। কিন্তু কোন ফল হয় না। একজন কনস্টেবল বলে যে সে জাতিতে হিন্দু, সুতরাং তাকে যেন একটা পৃথক কবরে কবর দেয়া হয়। মাতলা, হরেকের ভাই, বৃন্দাবন, নিমাই, পরাগ এবং অন্যান্যরা দারোগা সাহেব ও কনস্টেবলদেরকে কবরের মধ্যে লাঠি দিয়ে মারতে থাকে এবং তারপর কবর দেয়া হয়। আমিও দারোগা ও কনস্টেবলদেরকে কবর দেয়ার অংশ নেই। কবর দেয়া শেষ হলে আমি বাড়ি ফিরে আসি। পরদিন পুলিশের গুলির আওয়াজ শুনে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই।

স্বাক্ষর

স্টিফেন মার্দ্রি

পাদটীকা:

নাচোলে পুলিশ হত্যা মামলা চলার সময়ে সরকারী পক্ষ থেকে অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের পাশাপাশি ইলা মিত্র ও স্টিফেন মার্দির প্রদত্ত বলে কথিত দু'টি জবানবন্দি উপস্থাপন করা হয়। রাজশাহী জেলা জজের রেকর্ড রুমে রক্ষিত নাচোল পুলিশ হত্যা মামলা সম্পর্কিত নথিপত্রের ফাইলে ঐ জবানবন্দি দু'টির মূল কপি পাওয়া গেছে, যার নীচে ইলা মিত্র, স্টিফেন মার্দি ও একজন করে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর রয়েছে। ইলা মিত্র ও স্টিফেন মার্দি দুইজনেই রাজশাহীর প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আহমদ মিয়ার সামনে ১৯৫০ সালের ৭ নভেম্বরে ১ম দফা অভিযুক্তদের সাক্ষ্য দান কালে এরকম কোন জবানবন্দি প্রদানের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং উভয়েই জানান যে, পুলিশ বাহিনী অবর্ণনীয় শারীরিক নির্যাতনের পর জোর করে তাঁদের স্বাক্ষর আদায় করে নেয়।

কথিত জবানবন্দি প্রসঙ্গে স্টিফেন মাদ্রির বক্তব্য ছিল

আমি নিরপরাধ। আমি স্কুলে পড়ি। আমি তখন স্কুলে ছিলাম। আমি এই মামলার ব্যাপারে কিছুই জানি না। নওয়াবগঞ্জে নিয়ে যাবার পর পুলিশ আমাকে বেধড়ক মারধোর করে। পুলিশ আমার মুখে প্রস্রাব করে দেয়। প্রচণ্ড মারধোরের পর তারা জোর করে একটা সাদা কাগজে আমার স্বাক্ষর নিয়েছে। আমি কিছুই বলিনি এবং আমি কিছুই জানি না।

স্টিফেন মাদ্রি ৭-১-৫১ তারিখে অভিযুক্তের দ্বিতীয় দফা সাক্ষ্য দান করেন রাজশাহীর জেলা জজ-এস. আহমেদের কোর্টে। সেখানেও তিনি একইভাবে পুলিশের কাছে কোন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। ঐ একই দিনে প্রদত্ত সাক্ষ্যে ইলা মিত্রও কোন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানের কথা অস্বীকার করে বলেন–

আমি নিরপরাধ। আমি চণ্ডীপুর ছিলাম। কৃষকদের মধ্যে আমি কাজ করি এবং সে কারণে গ্রেপ্তার করে আমাকে এখানে আনা হয়েছে ও এই মামলার সাথে জড়ানো হয়েছে। ৭-১-৫০ তারিখে গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে শুরু করে ২১-১-১৯৫০-এর মধ্যে সম্ভবত আমি কোনো বিবৃতি প্রদান করিনি। ১৬-১-৫০ তারিখে পূর্ব লিখিত কথাবার্তা আমি আদৌ বলিনি। আমার উপর চরমভাবে যে নির্যাতন চালানো হয়েছে তার বিবরণ আমি নিম্ন আদালতে দিয়েছি।

ইলা মিত্র ও স্টিফেন মাদ্রির প্রদত্ত বলে কথিত এই জবানবন্দি দু'টিতে বর্ণিত ইলা মিত্র ও স্টিফেন মাদ্রির মুখে আরোপিত ঐ জবানবন্দি দু'টি প্রস্তুত করেছে পুলিশ এবং তারপর জোর করে তাঁদের স্বাক্ষর নিয়ে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে, ইলা মিত্র ও স্টিফেন মাদ্রি, প্রচণ্ড পুলিশী নির্যাতনের মুখে ঐ জবানবন্দি দু'টি নিতান্ত নিরুপায় হয়ে প্রথমে প্রদান করেছিলেন, কিন্তু পরে প্রাপ্ত প্রথম সুযোগেই তাঁরা তা অস্বীকার করেন। বাস্তবে যাই ঘটে থাকুক না কেন এটা ঠিক যে জবানবন্দিতে বর্ণিত অন্তত কতিপয় তথ্য তখন পুলিশের হাতে ছিল, আজাহার হোসেন সাক্ষৎকারে বলেছেন যে, সে সময়ে পুলিশী চরের নিত্য আনাগোনা সেখানে শুরু হয়েছিল। তাঁর জবানবন্দিতে বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে কোথাও কোথাও বিশেষত পুলিশ হত্যা সম্পর্কিত বর্ণনায়, অতিকথন থাকা স্বাভাবিক। কাজেই অপরাপর উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের সাথে সমার্থক হলেই কেবল ঐ দুটো কথিত জবানবন্দি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে। ইলা মিত্রের কথিত বিবৃতিটি সরকারী নথিপত্রের ফাইলে বাংলায় পাওয়া গেছে বলে হুবহু অনুলিপি দেয়া সম্ভব হয়েছে, কিন্তু স্টিফেন মাদ্রির বিবৃতিটি পুলিশী কর্তারা ইংরেজীতে রূপান্তরিত করে সংরক্ষণ করেছেন বিধায় তার বঙ্গানুবাদটি দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্টিফেন মাদ্রির জবানবন্দিটিতে ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো প্রতি-স্বাক্ষর এবং তারিখ উল্লেখ পাওয়া যায়নি। মুদ্রিত জবানবন্দি দুটি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করলে তাতে বর্ণিত তথ্যের মধ্যে প্রচুর অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে, তবে উভয়ের মধ্যে উল্লেখ করার মতো বেশ কিছু অভিন্ন বিবরণও পাওয়া যায়। যেমন: ৫ জানুয়ারি ১৯৫০ তারিখে পুলিশ যখন ঘাসুড়া গ্রামে আসে, তখন ইলা মিত্র, রমেন মিত্র ও বৃন্দাবন সাহাসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ চণ্ডীপুর গ্রামে ছিলেন। এবং খবর শোনার পর রমেন মিত্র ডুগডুগি বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেন। উভয় বিবৃতি থেকেই নাচোলে কৃষক বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক হিসাবে রমেন মিত্র ওরফে হাবু বাবু, ইলা মিত্র, মাতলা মাঝির ভাই, প্রমুখের কথা জানা যায়। তাছাড়া নাচোলে কমিউনিস্ট তৎপরতার মূল কেন্দ্র হিসেবে চণ্ডীপুরের কথাও উভয় জবানবন্দি থেকে আমরা জানতে পারি। উভয় বিবৃতিতেই বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রতিনিধি নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা এবং আজাহার হোসেন ওরফে পল্টু কর্তৃক তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার কথা জানা যায়। আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর যেমন, জমিদারি উচ্ছেদের প্রচারণা, সাত আড়ি জিন ও তেভাগার দাবির কথাও উভয় বিবৃতিতেই বিধৃত হয়েছে। সর্বোপরি উভয় থেকে জানা যায় ঘাসুড়ায় যখন পুলিশের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত সাঁওতালদের প্রথম দফা সংঘর্ষ হয়, তখন পুলিশেরা নিহত হয়নি, গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল। পরবর্তীতে তাদেরকে হত্যা করা হয়। তার মানে পুলিশ হত্যার ঘটনাটি সাঁওতাল-পুলিশ সংঘর্ষের আকস্মিকতায় সংঘটিত কোনো হত্যাকাণ্ড ছিল না; এটি ছিল পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কেননা প্রথম দফা সংঘর্ষ রোধ করার মতো যথেষ্ট সময় থাকা সত্ত্বেও এই জবানবন্দি অনুযায়ী, নেতৃবৃন্দ সে ধরনের কোনো উদ্যোগ নেননি। অর্থাৎ উপরের আলোচনা থেকে এটিই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নাচোলে দারোগাসহ ৪জন পুলিশ হত্যার ঘটনাটি বস্তুত তৎকালে কমিউনিস্ট পার্টি অনুসৃত রণদিভে লাইন প্রয়োগের অংশ হিসেবেই ঘটানো হয়েছিল। তবে এই প্রসঙ্গের শেষে এটাও উল্লেখিত হওয়া দরকার যে নাচোল পুলিশ হত্যা মামলার বিচারের সময় জেলা জজ এস. আহমেদ ইলা মিত্রের কথিত জবানবন্দিটিকে নয় বরং স্টিফেন মাদ্রির বিবৃতিটিকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণের মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি হিসেবে ইলা মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত বলে কথিত জবানবন্দিটি সরকারী তরফের তেমন কোন কাজে আসেনি।

তথ্যসূত্র: বইয়ের নাম: নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ ও সমকালীন রাজনীতি ও ইলা মিত্র লেখক: মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, বইয়ের পৃষ্ঠা: ১৫৭–১৬৪, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০০১, প্রকাশক: আহমেদ মাসুদুল হক, উত্তরণ প্রকাশনী, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০।

সারাবিশ্বে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম সফল হবেই: ইলা মিত্র

১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশে তেভাগা সংগ্রামীদের সংবর্ধনা প্রদানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অন্যান্য তেভাগা সৈনিকদের সঙ্গে ইলা মিত্রও তখন বাংলাদেশে আসেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত কয়েকটি বৃহৎ জনসমাবেশে ভাষণ দেন। সে সময় (১১ নভেম্বর) সিপিবি কার্যালয়ে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তা পরে একতা'র ওই বছরের ১৭তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কমরেড ইলা মিত্রের সেই সাক্ষাতকারের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে যুক্ত করা হলো।

প্রশ্ন: জমিদার পরিবারের বউ হয়েও কেন গরিব কৃষকদের স্বার্থে আন্দোলনে এলেন?

ইলা মিত্র: মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়েছি, আস্থা স্থাপন করেছি। সমাজ পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ ছিলাম। তাই গরিব কৃষকদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে আন্দোলন গড়ে তুলতে এবং এর আন্দোলনের মাধ্যমে তারা যেন নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন সেজন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি।

প্রশ্ন: গরিব মানুষ কি প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস করেছিল?

ইলা মিত্র: প্রথমে বিশ্বাস করেনি। বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে এদের সাথে থেকেছি, রুটি-পান্তা খেয়ে আমাকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে, আমি ওদেরই একজন।

প্রশ্ন: আন্দোলনের কর্মীদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

ইলা মিত্র: আমাকে গ্রেপ্তার করার পর অসংখ্য কর্মীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বলা হয় 'স্বীকার কর, রানী মা হুকুম দিয়েছিল– তাহলে খালাস পাবে।' কিন্তু কেউ মুখ খোলেনি। এদের মধ্যে একজন সাঁওতাল কর্মী, নাম তার হরেক। হরেক ঠিকমতো সভায় আসতো না বলে তিরস্কার করতাম। ও বলতো দেখবেন সময়ে প্রমাণ দেব। সেই হরেক পুলিশের অত্যাচারে মারা যায়, তবুও মুখ খোলেনি। এর থেকে কি ভালোবাসা আমি আশা করবো? ওই সময় সরকারি প্রশাসনেও আমরা ভালোবাসা পেয়েছি। যেমন: আমাকে অত্যাচারের পর রাজশাহী জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি মুমূর্ষু প্রায়। ওই সময়ে রাজশাহী জেলের পুলিশ অফিসার মমতাজ রহমান আমার গায়ে হাত তুলতে দেননি। রাত ১২টার পর মাথায় জল ঢেলে সেবা করেছেন।

প্রশ্ন: নারী অধিকার আন্দোলনকে কিভাবে দেখছেন?

ইলা মিত্র: ১৯৪৩ সাল থেকে আমি আন্দোলনের সাথে যুক্ত। এখনো অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। এজন্য শুধু মহিলাদের সংগঠিত হলেই হবে না, নারী ও নারী আন্দোলন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত। একে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক হবে না। সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারী মুক্তি সম্ভব।

প্রশ্ন: বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম কোন পথে?

ইলা মিত্র: মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী হয়ে আমরা সমাজতন্ত্রের আন্দোলনে নেমেছি। এটা ঠিক যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের পতনে ধাক্কা লেগেছে। তা সত্ত্বেও আমি মনে করি এটা সাময়িক বিপর্যয়– সমাজতন্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিজ্ঞান। একেক দেশের অবস্থা ও বাস্তবতা অনুযায়ী একে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োগে ভুলের কারণে হয়তো ওইসব দেশে সমাজতন্ত্রের সাময়িক পতন ঘটেছে। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবার কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হচ্ছে– ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। একদিন সারাবিশ্বে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম সফল হবেই।

তথ্যসূত্র: সাপ্তাহিক একতা, ২২ নভেম্বর ২০০২, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) মুখপত্র।

বিপ্লবী ইলা মিত্র ও কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

ইলা মিত্রের সাক্ষাৎকার

মালেকা বেগম

তেভাগা আন্দোলনের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপনের জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ইলা মিত্র ঢাকায় এসেছিলেন ১৯৯৬ সালের ৪ নভেম্বর। তিনি ঢাকা, নড়াইল, নীলফামারী, রাজশাহী, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় যোগ দেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটা ছিল তার চতুর্থ সফর। তবে ১৯৫০ সালে বন্দি হওয়ার পর এই প্রথমবার তিনি নাচোল ও রামচন্দ্রপুর গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। এবার বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, সাক্ষাৎকার নিয়েছি। সেই সাক্ষাৎকারে ঘুরেফিরে পুরোনো আলোচিত প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। নতুন যেসব প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন, সেসব কথা লিপিবদ্ধ করা হলো।

বাংলাদেশের এই মাটি আমার মাতৃ-পিতৃভূমি। আমার যৌবনের কর্মভূমি, ব্যক্তি জীবনের বহু যন্ত্রণা, বহু দুঃখ ও আনন্দের স্মরণভূমি। বাংলাদেশে আবার আসতে পেরে আমি গভীর আবেগে আপ্লুত হচ্ছি। সীমান্তের ওপারের জনগণের, বিশেষ করে নারী সমাজের প্রীতি ও শুভেচ্ছা বাংলাদেশের সব নারী-পুরুষ, শিশুর জন্য বহন করে এনেছি। সবাই তা সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করুন।

এই দেশ, আমাদের দেশের প্রতিবেশী। ভারত রাষ্ট্রের অন্যতম জাতীয় ভাষা বাংলা। বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা বাংলা। আমি এ দেশের যেখানেই গিয়েছি, মনে হয়নি বিদেশে এসেছি। মনে হয়েছে স্বদেশেই আছি। বরং ভারতে যদি পাঞ্জাবে, মাদ্রাজে বা অন্যত্র যাই আমার বিদেশি-বিদেশি মনে হয়। ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে সব জায়গাতেই দোকানের নাম, সাইনবোর্ড, বাড়ির নাম-ঠিকানা, পথের নির্দেশনামা-সবকিছুই বাংলা ভাষায় লেখা। এ দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে।

রামচন্দ্রপুর গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে এবার গিয়েছিলাম। আমার স্বামী রমেন মিত্রের বন্ধু আলতাব হোসেন মিয়া তাঁর বাড়িতে গ্রামের নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য স্কুলঘর দিয়েছিলেন ১৯৪৫ সালে। আমি তখন পড়িয়েছি ওই স্কুলে।

সেই স্কুলটি এখন হাইস্কুল হয়েছে। আলতাব মিয়া বৃদ্ধ হয়েছেন। দেখা হলো তাঁর সঙ্গে। আমার কী যে আনন্দের অনুভূতি হলো! তিনি চেষ্টা করছেন স্কুলটিকে কলেজে উন্নীত করতে। সে সময়ের ছাত্ররা এখন বড় হয়েছেন। চার-পাঁচজন দেখা করলেন। বুকভরে তৃপ্তির শ্বাস নিলাম।

সেই স্কুলের মাঠেই বড় সভা হলো এবার ৭ নভেম্বর। ছুটির দিন ছিল। কিন্তু স্কুলের সব ছেলেমেয়ে সভায় এসেছিল।

ওই গ্রামেই একটা আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করলাম। সব সভাতেই মেয়েরা, ঘরের বউরা এসেছেন। ১০ হাজার দর্শক-শ্রোতার মধ্যে তিন-চার হাজার নারী ছিলেন। মুসলিম মেয়েদের এভাবে সভায় যোগ দিতে দেখে আমার খুব ভালো লাগল।

সেখান থেকে নবাবগঞ্জে গেলাম। ১৯৪৫ সালে তা ছিল মহকুমা। এখন তো জেলা হয়ে গেছে। সেখানেও হাজার হাজার মানুষ সভাগুলোতে এসেছেন। আমার খুব ভালো লাগল।

কৃষক আন্দোলনের স্থান নাচোলে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম, মনে তখন ভয় ছিল। কৃষক আন্দোলনের সময় তো কৃষকদের ওপর খুব অত্যাচার হয়েছে, একা আমি তো অত্যাচারিত নই। তাদের গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল। প্রায় ১২টা গ্রাম তখন পোড়ানো হয়েছিল। তাদের অনেককে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল, বাড়িঘর সমস্ত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই তারা এখন কীভাবে আমাকে গ্রহণ করবে, সেই সংশয় ছিল মনে। গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, মানুষের ঢল নেমেছে। আদিবাসী বহু সাঁওতালসহ এক লাখের বেশি মানুষ সমাবেশে এসেছিলেন। কী সুশৃঙ্খল তাঁরা। কোনো স্বেচ্ছাসেবী নেই। কিন্তু সবাই সুন্দরভাবে বলেছেন, কথা শুনেছেন।

আমার আবারও অভিজ্ঞতা হলো যে, মানুষের মঙ্গলের জন্য সামান্যতম কাজ করলেও মানুষ তা ভোলে না। তাদের সেই যে মনে রাখা, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার বলে আমি মনে করি। সেই সভায় আমি বলেছি, তেভাগার সময় থেকে সংগ্রামের যে ধারা চলে এসেছে, আপনারা তা অব্যাহত রেখেছেন দেখে আমি আনন্দিত। সেই সময়ের আন্দোলনের কেউ হয়তো এখানে বেঁচে নেই। কিন্তু বাবা, দাদা, নানার মুখে শুনেই আপনারা সেই স্মৃতি বহন করে চলেছেন। তাই এই সভায় এসেছেন। আপনাদের সংগ্রামী চেতনা শেষ হয়নি, বরং বাড়ছে সেটাই আনন্দের বিষয়।

এবার সরকারি পর্যায়ে দুজন মন্ত্রী– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বলেছি: 'আপনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি নারী সমাজেরও প্রতিনিধিত্ব করছেন। নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

> 'আপনার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। একসঙ্গেই আমরা ঢাকা জেলে ছিলাম। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে ঢাকায় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে। তাঁর সময়ের ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় ছিল। এখন আপনি আসাতে ভারত ও বাংলাদেশের মৈত্রী বন্ধন আবারও দৃঢ় হবে আশা করি।
>
> আর শেখ মুজিবুর রহমান যে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, সেটিকে আপনিও অনুসরণ করবেন আশা করি।'

আমার যে মামলাটি পাকিস্তানের সময় থেকে প্রত্যাহার করা হয়নি, সেই মামলার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বললাম, আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সরকার মামলা প্রত্যাহার করবেন কি? তিনি বললেন, 'সেই পুরনো কাগজপত্র কোথায় চলে গিয়েছে। সেই মামলা কি আর আছে? মামলা আর নেই। আপনাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার যে চিঠি পাঠাতো জেল গেটে সারেন্ডার করার জন্য, সে রকম চিঠি পাঠালে কি আপনি খুশি হবেন? তাহলে একটা করে চিঠি পাঠাব। আপনার মতো একজন বন্দি থাকলে আমাদের ভালোই হয়।' এই বলে খুবই হাসিঠাট্টা হলো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন পানির সমস্যার কথা। আমি বললাম, দুই দেশের মধ্যে তো এখন খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে। কয়েক দিন পরেই আমাদের পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনিও আসছেন। নিশ্চয়ই সৌহাদ্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসা হবে– এই আশা আমি করি।

> কৃষি, খাদ্য ও ত্রাণমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথাও হলো আমার। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানালাম যে, বামপন্থী আন্দোলনের নেত্রী আজকে মন্ত্রী হয়েছে। আমি খুবই খুশি হয়েছি। কৃষকদের তো এত কালেও কোনো উন্নতি হয়নি। তাঁরা জমিও পাননি। নাচোলের কৃষকেরা আমাকে তাঁদের দুঃখের কথা বলেছেন।
>
> কতগুলো জাল নথি তাঁরা আমাকে দেখিয়েছেন। সব দখল করে নিয়ে তারপর জাল নথি তাঁদের ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তুমি একটু সচেষ্ট হলে বোধ হয় ভালো হয়। আমি তোমার কাছে এটা আশা করবো। মতিয়া বলল, 'আমি কৃষিমন্ত্রী হলেও এই বিষয়টা আমার অধীনে নয়। এটা হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে। আমি তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব এবং যাতে কৃষকদের উন্নতি করা যায়, সে চেষ্টা নিশ্চয়ই করবো।'

এবার এসে বাংলাদেশের নারী সমাজের আন্তরিক সংবর্ধনা পেয়েছি। ভারতের নারী সমাজের অবস্থা এ দেশের নারীদের চেয়ে খুব বেশি ভালো নয়। এ দেশে তো প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী নারী। তাঁরা তো নিশ্চয়ই মেয়েদের উন্নতির চেষ্টা করবেন। মেয়েরা যাতে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তা নিশ্চয়ই সরকার দেখবে।

ভারতে গণতান্ত্রিক ধারা দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত আছে বলে আমরা একটু ভালো অবস্থায় আছি বলা যায়। ভারতে এখন পঞ্চায়েত নির্বাচনে (বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের মতো) পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটিতে, করপোরেশনে এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

এককালে আমরা জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থীর জন্য এলাকায় গিয়েছি, গ্রামে গিয়েছি। ভোটের কথা যখন বলেছি, ঘরের বউরা থাকতেন আড়ালে। কথা বলতেন না। আজ সেই সব গ্রামের নারীরা বাইরে এসে শাসন পরিচালনা করছেন। তাঁদের দেখে উৎসাহিত হয়েছে আরও মেয়ে। আমরা বিধানসভা বা পার্লামেন্টে এক-তৃতীয়াংশ আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষণের দাবি করেছি। গত অধিবেশনেই পাস হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। কিন্তু বিজেপিসহ কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এই বিল পাস করতে বাধা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগামী সেশনেই এই বিল পাস করা হবে।

এটা খুবই সত্য যে, নারী সমাজের অবস্থা এবং অবস্থানের পরিবর্তন সারা পৃথিবীতেই হয়নি। কয়েকজন নারী ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, চাকরিজীবী, মন্ত্রী, এমপি এমনকি প্রধানমন্ত্রীও রয়েছেন। কিন্তু বড় বড় দায়িত্বশীল পদে মুষ্টিমেয় নারী থাকলেও নারী সমাজের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ভারতে যেমন তেমনি বাংলাদেশেও নারী নির্যাতন অব্যাহত আছে। এর প্রতিরোধে আরও জোরদার আন্দোলন আমাদের করতে হবে। রাজনৈতিক-সামাজিক প্রগতিশীল শক্তিকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দেশের নারীরা একসময় বেশি অধিকার পেত। সব মেয়ের জন্য শিক্ষা, চাকরি, মাতৃত্ব ও নারীত্বের বিকাশ এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু সাম্যবাদের বা মার্কসবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু ভুল ছিল নিশ্চয়ই। তাই সে দেশের নারী সমাজের অগ্রগতি হয়নি। তবে সেই দেশের মেয়েরা পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে অনেক উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছে, সেটা সত্য।

তথ্যসূত্র: বইয়ের নাম: ইলামিত্র, লেখক: মালেকা বেগম, প্রথম প্রথমা সংস্করণ: ফাল্গুন ১৪১৭, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১১প্রকাশক: প্রথমা প্রকাশন, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

তেভাগা সংগ্রামের ৫০ বছর পূর্তিতে
ইলা মিত্রের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য

১৯৪৬-৪৭-এর সারা বাংলার বিপ্লবী কৃষক অভ্যুত্থান তেভাগার ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন আয়োজনে ঢাকার আহুত সমীক্ষা সমাবেশে কিছু কথা উপস্থিত করছি।

সমবেত প্রিয় বন্ধুরা,

অভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমাদের উপমহাদেশে এবং সেই সূত্রে বাংলার তথা দুই বাংলার আধিয়ার বর্গাচাষীদের তেভাগার দাবিতে অভ্যুত্থান ও তার জয়জয়কারের (অর্থাৎ ১৯৪৭-এর জানুয়ারিতে বর্গাদার বিল পাশ হওয়া) ৫০তম বার্ষিকীতে তেভাগার সংগ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশীদাররূপে এই আন্দোলনের পূর্বাপর ধারার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিকে চোখের সামনে রেখে যে সব কথা মনে এসেছে সেগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপে ঢাকার এই মহতী সমীক্ষা সমাবেশে প্রিয় সাথী বন্ধুদের বিচার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করছি।

প্রথমে ১৯৪৭-৪৮-এর বাংলার তেভাগা উত্থানের বীর সংগ্রামী শহিদদের তথা বাংলার কৃষক মুক্তি সংগ্রামের সমস্ত অমর শহিদদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনের ও সাধারণভাবে স্বাধীনতা ও সাম্যের সংগ্রামে একাত্মব্রতী ও ব্রতিনীদের।

১৯৪৬-৪৭-এর তেভাগার বিপ্লবী কৃষক উত্থান সামগ্রিক কৃষকের মুক্তির প্রয়াসকে সামনে রেখে যে আংশিক সাফল্যের ধারা নিয়ে এগিয়ে চলার পথ করে দিয়েছিল তার গতি-পরিণতি গত পঞ্চাশ বছরের বিভিন্ন পর্বে নানা ধরনের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে কোথায় এসে পৌঁছেছি তার একটা হদিস করতে হবে আজ আমাদের অর্থাৎ আমরা যারা বিশেষ করে কৃষক মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনের মারফৎ জড়িত। সুতরাং তেভাগা উত্থানের সমস্ত দিকগুলিকে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে আজকের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা ও সাম্যের সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত করে উপস্থিত করছি এই সমাবেশের সমীক্ষকদের সামনে বিচার বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য। তেভাগার সূত্রটিকে ধরে আজ আমরা কৃষকদের সর্বাত্মক মুক্তি এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতা ও সাম্যের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠার লড়াইকে বিদায়ী শতকের শেষলগ্নে আসন্ন একুশ শতকের মুখে চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডের দিক থেকে এগিয়ে নিতে পারবো এই বিশ্বাস রাখি। এদিক থেকে তেভাগার সমীক্ষা একটা জরুরি ও বড় মাত্রার ভূমিকা রয়েছে।

সম্প্রতি ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িকতাবাদী কায়েমী স্বার্থসমূহের এবং তাদের পিছনে নতুন কৌশল নিয়ে উপস্থিত সাম্রাজ্যবাদী নয়া উপনিবেশিক পুঁজিবাদী-যুদ্ধবাজ পশ্চিমা বৃহৎশক্তিবর্গের ও বিশেষ করে মার্কিন আগ্রাসী বহুমুখী তৎপরতায় উৎসাহিত সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদীদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের নানাধরনের প্রয়াস সর্বাত্মক জনমুক্তির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে বানচাল করে দিতে চাইছে।

> স্বাধীনতা ও সাম্যের সংগ্রাম আজ আবার নতুন করে ১৯৪৬-৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার এক চরম বিশৃঙ্খলার নতুন নতুন চাল ও চাপের সম্মুখীন। সুতরাং তেভাগার পূর্বাপর গতি-পরিণতি এবং এই মুহূর্তে এই তেভাগার মুক্তিধারা কোথায় এসে পৌঁছেছে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট খোঁজ খবর ও হিসাবনিকাশ করার পাশাপাশি সাধারণভাবে সমস্ত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম ও সাধারণভাবে সমগ্র স্বাধীনতা ও সাম্যের বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় জনমুক্তির নিরন্তর প্রয়াস ও উত্থান আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তার একটা জরিপ ও সিদ্ধান্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে অবশ্যই তেভাগার ঘটনাটা হবে এই সার্বিক খোঁজখবর ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি। এই বিবেচনাটিকে সামনে রেখে আমার বক্তব্যটিকে কয়েকটি বিষয়ান্তরে প্রক্ষিপ্ত করছি। অর্থাৎ প্রথমে তেভাগার ঘটনাটা কি তার একটা আভাস দিয়ে পরে অন্যান্য সমস্ত দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সর্বপ্রথম তেভাগার কর্মকাণ্ড ও ইতিবৃত্ত ও কর্মকাণ্ডটিকে উপস্থিত করছি। কোথায় কখন কিভাবে এর সূত্রপাত আমাদের উপমহাদেশের হাজার হাজার বছরের কৃষক জীবনের কিছুটা লিখিত এবং প্রধানত অলিখিত ইতিহাস থেকে আমাদের তথ্য গ্রহণ করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ১৮ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ সমগ্র উপমহাদেশে তথা বাংলায় বৈদেশিক ব্রিটিশ পুঁজিবাদী বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক প্রভুত্ব তথা প্রত্যক্ষ শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। এদের ব্যবস্থাপনায় সূচনা হয় জমিজমার মালিকানায় জমিদারদের চিরস্থায়ী করা। হাজার হাজার বছরের রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের আবহে গ্রামাঞ্চলে যেসব বিভিন্ন ধরনের বিশেষ সুবিধাভোগীর ছোট ছোট চক্র গড়ে উঠেছিল আদিম দাস ব্যবস্থার ধারায়– সেগুলিকে ছাপিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতী বিলি ব্যবস্থার দৌলতে চাষীরাই পালন করে আসছিলেন ফসল ফলিয়ে যাবার দায়দায়িত্ব ব্রিটিশ শাসকের লুণ্ঠন ও জমিদারি মালিকানাবিধি জারির পরে এই দায়দায়িত্ব উনিশ শতকের শুরু থেকেই (ইতিপূর্বে প্রচলিত হলেও) অপ্রধান জোতদারদের ওপর প্রধানত ন্যস্ত ছিল, যারা চাষী নামে অভিহিত হলেও ছিল চাষীর শোষক। ব্রিটিশ শাসক ও জমিদারদের আমলে এরা পেয়ে যায় ফসল ফলাবার শিরোপা। এরা হাজার হাজার বিঘা চাষের জমির বন্দোবস্ত পেয়ে তাতে ফসলের অর্ধেক তুলে দিতে হবে জোতদারদের গোলায় এই শর্তে আধিয়ার বা ভাগচাষী নামে অভিহিত চাষীদের বন্দোবস্ত দেয়।

বর্গাদার নামে অভিহিত এই আধিয়ার চাষী বর্তমান বিশ শতকের শুরু থেকে সমস্ত রকমের সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও গভীর বিদ্রোহের অংশীদার হয়। তারা দাবি তোলে দুভাগের একভাগ ফসল জোতদারের গোলায় তুলবে না, তিনভাগের একভাগ ফসল তারা জোতদারের গোলায় তুলবে। এই সূত্রে বাংলার চাষীদের একাংশের একটা বিশেষ ধরনের উত্থান পরিচিত হয় তেভাগা নামে। ১৯৪৬-৪৭ সালে এই তেভাগার ভিত্তিতে বিপ্লবী উত্থান ঘটে এবং জয়ী হয়।

> আজ আমরা এই তেভাগা উত্থানের সমীক্ষায় বসেছি– উত্থানের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপনের নানা ধরনের কর্মসূচির মাঝখানে। সুতরাং তেভাগার এই ব্যাপারটাকে আমাদের কৃষকমুক্তি সংগ্রামের অন্যান্য সমস্ত ভাবনাচিন্তা ও কর্মকাণ্ডের পুরোভাগে রাখতে হবে। এই উত্থান একদিকে আংশিক আবার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক। বস্তুতপক্ষে তেভাগার উত্থান সমগ্র কৃষকমুক্তি তথা কৃষিবিপ্লব বা ভূমিবিপ্লবের প্রয়োজন ও আয়োজনের মূলধারাস্বরূপ। এই মূলধারার কিছুটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তাই তাকাতে হবে এর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রশ্ন ও ঘটনার দিকে।

এই ঘটনা প্রশ্ন ও প্রকরণগুলি নিম্নরূপ: আমাদের উপমহাদেশে কৃষক সমাজ ব্রিটিশ বৈদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার মুখে এবং পরবর্তী পর্যায়ে পর্বে পর্বে সাধারণত ছাড়াছাড়াভাবে এবং কোনো কোনো সময়ে প্রায় একই সঙ্গে স্বাধীনতা রক্ষাকে লক্ষ্য নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিরোধ ও আক্রমণাত্মক জনগণ উত্থানের পুরোভাগে প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘটিয়েছে। তাছাড়া শোষক ও শাসক চক্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে নিরন্তর বিদ্রোহ করেছে। বস্তুতপক্ষে বর্তমান শতকেও ব্রিটিশ শাসনের উৎখাতের কর্মকাণ্ডে সামনের সারিতে থেকেছে কৃষকরা। বিশ ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে কৃষক সমাজ বিপ্লবী উত্থানের স্বাধীনতা ও সাম্যের সহজ সরল ও বস্তুতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবর্তনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে, সারা সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু যাকে কৃষিবিপ্লব বা ভূমিবিপ্লব বা এ্যাগ্রোরিয়ান রেভোলিউশন বলা হয় সেটা ঘটেনি। অথচ এ্যাগ্রেরিয়ান মুভমেন্ট বা কৃষক আন্দোলন ঘটে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে আরপিডি (R. P. D) ঘটনাটাকে কৃষিবিপ্লব বা ভূমিবিপ্লবের দিকে চলা বলে অভিহিত করেছেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা উত্থানের মুখে R. P. D এই কথাটা বলেছিলেন। গত পঞ্চাশ বছরে ভূমিবিপ্লবের অভাবে এই উত্থানের বাস্তবতাকে আমরা সম্ভাবনায় পরিণত করতে পারিনি। তেভাগাও পারেনি সেদিন কোন একটা পথ করে দিতে। অর্থাৎ তেভাগার বহুমুখী আন্দোলনকে গত পঞ্চাশ বছরে আমরা কাজে লাগাতে পারিনি।

আমাদের পরবর্তী বিবেচ্য হলো গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের ইতিপূর্বেকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাস সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক শাসকচক্র ও তাদের অনুবর্তীরা যেভাবে ঘটিয়েছিল এবং ঘটাতে চেয়েছিল, ঠিক

সেরকমটা ঘটেনি। তবে স্বাধীনতার পরবর্তীকাল স্বাধীনতা, সাম্য ও গণতন্ত্রের বর্তমান শতাব্দীর চাহিদা অনুসারে সুস্পষ্ট রূপ পেয়ে ওঠেনি।

কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধসে পড়েছে এবং জমিদারি ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধানগত বিলুপ্তি ঘটেছে। বৈদেশিক উপনিবেশিক যুদ্ধবাজ মার্কিন সামরিক শক্তির খপ্পর সমগ্র উপমহাদেশকে গ্রাস করতে না পারলেও খণ্ডখণ্ডভাবে ঘাঁটি গেড়েছে। জমিদাররা হয় জোতজমির মালিকানা হারিয়েছে অথবা জোতদারদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এমন সব বেষ্টনী তৈরি করেছে– যেগুলি জমি-জমার ওপর চাষীর অধিকার ও ফসল ফলানোর ব্যাপারটাকে এবং কৃষি উৎপাদনের সমস্ত রকম প্রয়াস থেকে চাষীর উদ্যোগ আয়োজনকে অপসারিত করে জাতীয় পুঁজিবাদী স্বার্থে বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা চালু করেছে। চাষীরা ব্যাপকভাবে জমিজমা থেকে উচ্ছেদ হয়ে জোতদার ও ব্যবসায়ী মহাজনদের হাতে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তুলে দিচ্ছে। এই জোতদার মহাজন ও ব্যবসায়ীরা আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া মুষ্টিমেয় ধনিক বণিকদের কাছে যারা একদিকে যেমন গ্রামীণ জীবনকে জোতদার জমিদার ও ব্যবসায়ীদের খপ্পরে রাখার পাকা বন্দোবস্ত করেছে, তেমনি দরিদ্র আর সর্বহারা চাষীর রক্তজল করা পরিশ্রমে ফলানো ফসলের সমস্ত দায়-দায়িত্বকে এর ভাবনা-চিন্তা হিসাবে ধনিক বণিক ব্যবসায়ী মহাজনদের কোটিপতি চক্রগুলোর বিশ্ববাজার দখলের কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ রেখেছে। জারি হয়েছে নয়া উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের খোলাবাজার। এই খোলাবাজারের পিঞ্জরকে কৃষক সমাজ অবশ্য মেনে নেয়নি। তারা বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে কৃষক সমাজের এই বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ এবং মাঝে মাঝে বিপ্লবী উত্থান বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে স্বাধীনতার জন্য আয়োজিত বিভিন্ন উত্থানের কর্মকাণ্ডে স্বার্থকতার মুখ দেখেছে।

> বাংলাদেশের বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুক্তিযুদ্ধে কৃষক সমাজ মূলধারারূপে কাজ করেছে। কিন্তু কৃষক সমাজ বাংলাদেশে অথবা উপমহাদেশের অভ্যন্তরে তথা পশ্চিম বাংলায় কৃষিবিপ্লব বা ভূমিবিপ্লব অথবা এ্যাগ্রেরিয়ান রেভোলিউশন ঘটাবার তেমন বড় রকমের কিছু ঘটাতে পারেনি। কারণ জাতীয় বুর্জোয়ারা কৃষক সমাজের সাহায্যে স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে এলেও সমাজতন্ত্রের আশঙ্কায় কৃষিবিপ্লব বা ভূমিবিপ্লবের মধ্যে যেতে পারেনি। কারণ ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে যে সমগ্র বিপ্লবের সূচনা হয়েছে তাতে তারা ভয় পেয়ে যায়।

[illegible] সঙ্গে ১৯৪৬-৪৭ সালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির [illegible] ভূমিবিপ্লবের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। তেভাগার সঙ্গে সঙ্গে [illegible], নাচোলের সাঁওতাল বিদ্রোহের পাশাপাশি যশোহরের [illegible] ছিল ভূমিবিপ্লব গড়ার প্রয়াস। কিন্তু নয়া

উপনিবেশিক সামরিক সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় কোটিপতি ধনিক বণিক গোষ্ঠীগুলো এই সমস্ত প্রয়াসকে অগ্রসর হতে দেয়নি।

কৃষক সমাজও তার প্রতিনিধি সংগঠকরূপে আমরা যারা গত পঞ্চাশ বছরের পর্বে পর্বে নানা-ধরনের কাজ করেছি তারাও পারিনি ভূমিবিপ্লবের কর্মকাণ্ডকে কর্মসূচির মধ্যে নিয়ে আসতে।

কেন পারিনি আজ সেটা বুঝবার এবং ভূমিবিপ্লবের কর্মসূচি হাতে নেবার উপযুক্ত আয়োজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। তেভাগা উত্থানের পঞ্চাশতম বার্ষিকী পালন করতে গিয়ে উপরোক্ত দুটি বিষয়ের সঙ্গে এবং সেই সূত্রে তেভাগার উত্থানের সঙ্গে যুক্ত আরও দুটি বিষয় আমার আলোচ্যসূচির প্রস্তাবে রয়েছে। এর প্রথমটি হচ্ছে, গত পঞ্চাশ বছরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জয়জয়কারের পরে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহকে নিয়ে গড়া সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে আফ্রো-এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত এলাকা থেকে বিদেশী শাসকদের বিদায় এবং শতাধিক স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্ব গঠিত হয়, তাতে যে কৃষকমুক্তির ভিত্তি গড়ে উঠেছিল তাকেও কি আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি নিয়ে কৃষক সমাজ ও তার পক্ষ নিয়ে কৃষক সংগঠনসমূহ প্রসারিত করতে পেরেছি?

আমাদের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিপর্যয়, সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধস নেমে আসে। এর ফলে আমরা নয়া উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত খোলাবাজার অর্থনীতির ফাঁদে পড়ে গিয়েছি। এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার বড় উপায় হচ্ছে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের মধ্যে সমাজতন্ত্রের নির্মাতাদের পুনরুত্থান। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিপ্রয়াসের পুনরুত্থান। এই মুক্তি প্রয়াসের বড় ভিত্তি হচ্ছে কৃষক সমাজ।

অপর বিষয়টি হল, যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক অভিশাপ আমাদের উপমহাদেশকে গ্রাস করেছিল তা সত্ত্বেও গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার দিকে এগিয়েছি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের দারক-বাহকেরা অভ্যন্তরীণ কায়েমী স্বার্থ ও বৈদেশিক নয়া উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে আবার মাথা তুলছে। সুতরাং এ দিক থেকেও চাই নতুনতর প্রবলতরভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হওয়া। তেভাগার উত্থান ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবার একটা বিশেষ আবহ। সুতরাং তেভাগার পঞ্চাশতম বার্ষিকী হোক এদিক থেকে প্রস্তুতি ও পদক্ষেপের একটা বৈপ্লবিক মুহূর্ত। পরিশেষে দু'টি কথা সামনে রাখছি মার্কসীয় তত্ত্বের দিক থেকে :

(১) প্রথমত, বাস্তবতা তথা বাধাবিপত্তি ও নানা ধরনের আক্ষেপ ও বিক্ষেপকে পদে পদে সরিয়ে এগিয়ে চলে আসছে সর্বাত্মক মুক্তিরধারা। বিপ্লব উত্থানের গতিধারার মূলসূত্র দ্বান্দ্বিক সামগ্রিকতার ধারায় (Dialectical totality) মুক্তির প্রক্রিয়ার নব নব বিন্যাস নব নব বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে চলে আসছে।

এই সূত্রে ঐতিহাসিক বাস্তবতাবাদ বলে একে অভিহিত করা যেতে পারে। সুতরাং তেভাগার উত্থানের সাফল্যকে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের কৃষক সমাজের তথা উপমহাদেশের সমস্ত মুক্তিপ্রয়াসী জনসমাজের মুক্তি সংগ্রামের সার্বিক দ্বান্দ্বিক জয়-পরাজয় বা অগ্রগতি ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার ধারার মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে।

(২) শ্রম বা শ্রমশক্তি (Labour বা Labour power) শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের মূলধারা। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মত আমাদের উপমহাদেশেও শিল্প বিপ্লব বা Industrial revolution-এর ধারায় কলকারখানার মত ক্ষেতখামারেও আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও যন্ত্রপাতির প্রবর্তন হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কৃষক বা চাষী তথা ভূমিকর্মীর বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু সমস্ত ঘটনার দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, ভূমিকর্মীর তত্ত্বাবধানের অভাব ঘটলে অচল হয়ে যায় যন্ত্রপাতি। ব্যাপারটাকে আমরা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়া ফসল উৎপাদনের কর্মকাণ্ডের চালনার দিকটাকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারব। আধুনিকতম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রয়োগের যেসব কলকারখানা গড়ে উঠেছে সেখানে শ্রমিক ছাড়া মুহূর্তে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। চার্লি চ্যাপলিনের "Modern Times" ছবিতে এই ঘটনা লক্ষণীয়। সুতরাং ধনিক বণিকেরা শ্রমিকের দ্বারস্থ হতে বাধ্য। আজ তেভাগা আন্দোলনকে স্মরণ করে সেদিনের সংগ্রামের যে পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বাংলার ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা উত্থানের বীর সংগ্রামী অমর শহিদদের পুনরায় শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।

তথ্যসূত্র: সাপ্তাহিক একতা, ৮ নভেম্বর ১৯৯৬, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) মুখপত্র

আমার জানা পূর্ব বাংলা

ইলা মিত্র

পূর্ব বাংলার সাধারণ গরীব চাষী গৃহস্থরা পাকিস্তানকে যে ভাবে তৈরী করতে চেয়েছিলেন আমি তার একজন সরেজমিন সাক্ষী। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানকে গড়ে পিটে নেবার জন্য তাঁদের উষ্ণ আবেগের হাপরের মধ্যেই আমি পড়ে গিয়েছিলাম। তখনই দেখেছি হিন্দু-মুসলমানে দেশ ভাগের জন্য ভেদ-বিভেদের আন্দোলনে হুংকার সহযোগে সামিল হতে যারা কার্পণ্য করেনি, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরমুহূর্তে তাদের চোখমুখ ব্যবহার কিভাবে বদলে গিয়েছিল। এবার দায়িত্ব এসে গেছে। নির্মাণের পালা এল। আর ভেদাভেদ খাটে না।

রাজশাহী জেলার অধীন একটি অজ, অখ্যাত গাঁয়ে আমার শ্বশুরবাড়ি। যদিও কলেজে পড়া, বিএ পাস করা এবং খেলাধুলা, লাফঝাঁপেও তুখোড় বলে আমি পরিচিতা ছিলাম, তবু বিয়ের পর আমার করুণ বন্দিনী দশা সহজে কাউকে বোঝানো যাবে না। সাত-মহলা জমিদারবাড়িতে আমার অতীত জীবন কবরে চাপা পড়ে গেল।

শ্বশ্রূমাতার কাছে নানা আজব কাহিনী শুনে শুনে আমি তখন তাঁদের পরিবারের বধূ হওয়ার উপযুক্ততা অর্জনের পাঠ নিচ্ছি। কোনো এক কালে তিনি একবার স্টিমারে কোম্পানির বাষ্পীয় জলযানে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তার ফলে তল্লাটজুড়ে রটে গেল, জমিদার গিন্নিদের বদন দেখা যায় না কথাটা ফাঁকা। কারণ, তাঁদের অনেকেই স্টিমারে সেই মুখ দেখে ফেলেছেন। আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুর ক্ষোভ ও উষ্মায় টং হয়ে গেলেন। তিনি আদেশ জারি করলেন, আর কোনো দিন ঘরের বউ যেন সাধারণ মানুষের পাইকারি যাতায়াতের স্টিমারে না ওঠে। তারপর যতবার শাশুড়ি ঠাকুরানী বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে নৌকায় যেতে হয়েছে। তাতেও একটা বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছিল। জলের ঢেউয়ে নৌকার দোলায় ভারি ভয় লাগে। সে জন্যই হুকুম ছিল, নৌকা হাঁটুজলে চালাতে হবে এবং নৌকার আগে আগে বাড়ির একজন জোয়ান পাহারাদার হেঁটে হেঁটে বউকে অভয় দেবে। এখানে এমন জল নেই যে মানুষ ডুবে মরতে পারে।

আমার এমন যে শ্বশ্রূঠাকুরানী, পাকিস্তানে জন্ম, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয়। সহজ বিশ্বাসেই তিনি বললেন, 'মুসলমানদের মধ্যে চিরজীবন কাটিয়েছি, তারা ছাড়া বাইরের কেউ তো আমার রাজত্বে আসছে না।'

গৃহকর্ত্রীর এই রায় শিরে ধারণ করা ছাড়া গতি নেই। আমরা পাকিস্তানের মানুষ হলাম। নড়াচড়ার কোনো কথাই উঠল না।

১৪ আগস্ট, সাতচল্লিশ সাল। আমাদের অখ্যাত পাড়াগাঁয়েও এমন এক বিশাল সভা হলো, কোনো দিন কেউ যা দেখেনি। মহল ছেড়ে গৃহবধূর বাইরে আসার কথাটা অবান্তর। তবু সেই বিরাট মানবতার ছন্দময় সংগীত 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পাশিতে' বাধা রইল না। এই সমাবেশে পতাকা উত্তোলনের ভার পেলেন আমার স্বামী রমেন মিত্র। হিন্দু-বিদ্বেষ কোথায় কর্পূরের মতো উবে গেছে। বরং সে কী কৃতজ্ঞতার জোয়ার, সম্পূর্ণ সুযোগ থাকতেও আমরা পাকিস্তান ছেড়ে যেতে চাইনি। এ তো শুধু একটি পরিবারের কথা নয়। আমরা থাকলেই তল্লাটের সহস্রটা পরিবার সাহস পাবে, নিরাপত্তা বোধ করবে। একবার সুযোগ পেলে তারা নিশ্চিতই বুঝিয়ে দিতে পারবে, কেউ আর বিভেদ ও বিবাদ চায় না। এবার সুখী, স্বাধীন, সমৃদ্ধ পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য হাতে হাত ধরা।

তারপর মাত্র দুটি বছর যখন পাকিস্তানী জনমানসের অভূতপূর্ব ভাবাবেগ, প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস, প্রবল কর্মোদ্যোগ ও মহা উল্লাসের তরঙ্গে তরঙ্গে আমি ভেসে বেড়িয়েছি, চারপাশের জমিদার বাড়ির দেয়াল কখন যে লুপ্ত হয়ে গেছে, আমি নিজে মুক্ত হয়েছি, কৃষক আন্দোলনের কর্মী বনেছি এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানেরই উচ্চমহলের শাসকদের আকাঙ্ক্ষার বিঘ্নরূপে পুনরায় পাকিস্তানী কারার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। দেড় যুগ পর সেই অতীতের দিনগুলো পর্দার ছবির মতো নিজের কাছেই রোমাঞ্চকর মনে হয়।

> বিএ পাস করা একটি মেয়ে তাদের গ্রামে নিষ্কর্মা বসে থাকবে, নবীন পাকিস্তান তা কি মেনে নিতে পারে? আমাদের বাড়ির চত্বরেই একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলা হলো। তিনজন ছাত্রী, আমি হেডমিস্ট্রেস। যদিও বাড়ির দালান থেকে বিদ্যালয়ের ঘর ৪০০ গজের বেশি ছিল না, তবু পরিবারের মর্যাদা রক্ষার্থে আমাকে গরুর গাড়িতে আসতে হতো। এই রাস্তাটুকু হেঁটে চলার অনুমতি পেতে আরও তিন মাস লেগেছিল। ছাত্রী সংখ্যাও তত দিনে পঞ্চাশের কোঠায় উঠেছে।

এই বালিকা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই গ্রামে আমি পাকিস্তানের গরিব গৃহস্থদের সংস্পর্শে এসেছিলাম। কিন্তু সে যে আসলে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও প্রবেশ, তা কি সেদিন জানতাম? মেয়েদের স্কুলে আসা নিয়ে মুসলমান সমাজ দুটি বিরোধী পক্ষে ভাগ হয়ে গেল।

জমি জমার উপরতলার মালিকেরা সর্বত্র কী এক নূতনের মধ্যে বিপদের ঘ্রাণ পেয়ে কুকুরের মতো মাটি শুকতে শুরু করলো। ওরা শরিয়ত খুলে মেয়েদের বে-পর্দা ম্লেচ্ছ শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করলো। অপরদিকে গ্রামের গরিব গৃহস্থরা জড়ো হলো পৃথক সারিতে আরও বড়ো সমাবেশে। সম্পত্তিবানদের যুক্তির জালকে তারা যে নিপুণ সূক্ষ্মতায় ছিন্নভিন্ন করে দিতে থাকল তার কোনো তুলনা হয় না।

জমিহীন, কপর্দ্দকহীন এবং নিজে সম্পূর্ণ অক্ষরজ্ঞানশূন্য ক্ষেতমজুর ওয়াজের মোড়ল– বালিকা বিদ্যালয়ের বিতর্কের জনসভায় দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণে বললেন, 'ঐ যে আমিনা বিবি মিয়া পাড়ার সাহেবদের খামারে বাঁদীগিরি করে সে বুঝি মুসলমান নয়! নদীর জল টেনে সাহেবদের স্ত্রীদের জন্য যারা স্নানের জল যোগায় সেই মুসলমান মেয়েরা আল্লার কাছে বুঝি অস্পৃশ্য!'

এভাবেই গ্রামের যে সমাজদ্বন্দ্ব শ্রেণিদ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হতে থাকে, আমি তাতে আকণ্ঠ ডুবে গেলাম। সাধারণ মানুষ পাকিস্তানকে নিজেদের সাধ্যমতো গড়তে গিয়ে আমাকেও আগুনে গড়ে পিটে মানুষ করে নিচ্ছিল।

গরিবের কৃষক আন্দোলনেও কখন সুড়িসুড়ি ঢুকে পড়েছিলাম, টেরও পাইনি। রাজনৈতিক কর্মীর সিদ্ধান্ত নিয়ে নেমে পড়ার পারিবারিক প্রতিকূলতাকে কি সাধ্য আমি নিজে ছিঁড়ব? কিন্তু দেশের বানই ঘরকে ভাসিয়ে দিল। মেয়েদের স্কুল নিয়ে দুই দলের ঝগড়া নতুন পল্লবে! নতুন নতুন দিগন্ত প্রসারিত হতে থাকে। বড় সাহেবরা ঋণ টাকার সুদ খায়। গরিব দল হেঁকে বলল, শরিয়তে সুদ খাওয়া হারাম। ধিকিধিকি এই প্রচার ক্রমেই গ্রামে গ্রামে দাবানলের সৃষ্টি করে। তখনই দেখেছি, এমনকি যারা মৌলবি ও মোল্লা, তারাও দলে দলে ছুটে গেছে এবং কৃষক আন্দোলনের কাগজ হাতে নিয়ে গরিব শ্রেণির একতা সংগ্রামের বাণী প্রচার করে বেড়িয়েছে।

পাকিস্তান বলতে গ্রামের গরিব গৃহস্থরা যা বুঝেছিলেন, স্বভাবতই তা সহজে হওয়ার ছিল না। সমাজ দুটো বিবদমান শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। সুদের পর এল ফসল ভাগের প্রশ্ন। তারই মাঝে এক জঙ্গি সংগ্রামের অভিযোগে আমরা গ্রেপ্তার হলাম। ইতিমধ্যে কখন ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছি, শুধু তা-ই নয়, অচিন পল্লিতে পলাতক অবস্থায় নতুন মানবতার মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে মিশে একাকার হয়ে গেছি।

আমাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযোগের সত্যাসত্য নিয়ে আলোচনা বৃথা। তবে একথা নিশ্চিত চার জনের একটি পুলিশ পার্টি গ্রামে জোর করে খাজনা আদায়ের জন্য ঢুকে আর ফিরে এল না। পুলিশ কোনোদিন তাদের লাশও খুঁজে পায়নি। গ্রামের গরিব শ্রেণির আশা আকাঙ্ক্ষা যখন দমিত হয়, তখন তার বিস্ফোরণের ইতিহাস কিছু নতুন নয়। হত্যা ভাল কি মন্দ সেই চুলচেরা বিচার এখানে হাস্যকর। এমন কি হত্যা কখনও কখনও আত্মহত্যা হতে পারে। শুধু এ কথাটাই তখন প্রতিভাত হয়েছিল– এই যে পাকিস্তানের আত্মাকে দমন করার যে প্রক্রিয়া চলছে তার ভবিষ্যৎ শুভ হবে না। আজও কি তারই পুনরাবৃত্তি দেখছি না? ভারত-পাক সীমান্তে পাক শাসকগোষ্ঠী যে যুদ্ধ লাগাতে চায়, সবার আগে সে কি নিজের ঘরের মানুষকেই আগুনে পুড়িয়ে আসেনি। অপরদিকে মুক্তির জন্য, শান্তির জন্য, প্রতিবেশীর সঙ্গে নির্ভয়ে বসবাসের জন্য এবং নিজরাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য পূর্ববাংলার যে আন্দোলন শাসকেরা কোনোক্রমে দমাতে পারছে না, বহু অভিজ্ঞতার শিলার উপর না দাঁড়ালে তা কি এমন ব্যাপক ও সুদৃঢ় হতে পারতো?

পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রাম ও তল্লাশ জুড়ে মানুষের যে মূর্তি দেখেছি, তা কখনও একটি সীমাবদ্ধ ঘটনা ছিল না। জেলে ঢোকার পর আরও বড়ো আরও মহৎ ও বিশাল আন্দোলনের পরিচয় পেতে থাকলাম। রাষ্ট্রদ্রোহী বলে প্রচার করেও আমাদের মামলায় সরকার পক্ষ একজন মুসলমান সাক্ষীও যোগাড় করতে পারেনি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সরকার পক্ষ মুসলীম লীগ পূর্ব বাংলা থেকে উৎখাত হয়ে গেল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী মানুষের সেই রায়কেও উপেক্ষা করে মিলিটারী শাসন কায়েম করেছেন। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁদের সেই জঙ্গী রাজত্ব বাঁচাবার জন্য দুনিয়ার তাবৎ জঙ্গী রাজাদের সঙ্গে মিতালীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

পূর্ববাংলার মানুষ আজও লড়ছে। না লড়ে তাদের কোনো উপায় নেই। সংগ্রাম সহজ নয়, কুসুমাস্তীর্ণ তো নয়ই। সেদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, আজও কি তাদের মধ্যে নেই? ভারতের ভূমিখানা রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃথক। ভাগ্য পরম্পরায় আমি আজ এখানে। কিন্তু প্রতিবেশী পাকিস্তানের যে মানুষ আজ ভারতের সঙ্গে মিত্রতার ও বন্ধুত্বের হাত মিলাবার জন্য প্রাণ উপেক্ষা করে লড়ছেন আমার কী সাধ্য আছে এদিক থেকে হাত বাড়াবার জন্য আমি না খেটে পারি?

পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে মিত্রতার জন্য লড়া আমার কাছে মুক্তিপণ পরিশোধ দেবার মতোই অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে রয়েছে। বৃদ্ধ শ্বশুরালয় এবং পাকিস্তানী কারাগার এই দুটো কবর থেকে দু-দুবার যাঁরা আমাকে উদ্ধার করেছেন, তাঁদের মুক্তি সংগ্রামে পেছনে পড়ে থাকার মতো অকৃতজ্ঞ কীভাবে আমি হই?

তথ্যসূত্র: বইয়ের নাম: ইলা মিত্র, লেখক: মালেকা বেগম, প্রকাশকাল: ১লা বৈশাখ ১৩৯৪, প্রকাশক: মোতাহার হোসেন, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ৯২ আরামবাগ, ঢাকা-১২০৫।

পূর্ববাংলা আজও আমার তীর্থভূমি

ইলা মিত্র

মাত্র সেদিনও পুবের আকাশে কোনো বিমানের শব্দ পেলে এপারে আমরা আঁৎকে উঠেছি। সূর্যোদয়ের দিক থেকে মৃত্যুর শিখা ছুটে এসেছে। এপারে প্রত্যুত্তরের যে ক্রুদ্ধ গর্জন জেগেছে তাও নিয়তির মতো নিষ্ঠুর। আজ অস্ত্র সংবলিত হয়েছে, কিন্তু শান্তি দূরে। দশ বছর আগে এই বিমান পথেই যেদিন পূর্ব বাংলা থেকে বিদায়ের পাড়ি দিয়েছিলাম সেদিনের কথা মনে পড়ে। আমার পাশে যিনি ছিলেন, তিনি শুধু পাকিস্তানী নন, পাকিস্তান রাষ্ট্রেরই একজন উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার সজল সমতল সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকবারই প্রশ্ন করেছিলেন এই মাটির প্রতি ভালবাসা বিদেশিনী হয়ে ভুলে যাব নাকি। অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন আবার ফিরে আসি। পাকিস্তানে আমার মতো 'কন্যা'র প্রয়োজন আছে। কী জবাব দিয়েছিলাম স্পষ্ট করে মনে নেই। নিশ্চয় আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাসের কথা বলেছিলাম। এখন কিন্তু বুঝতে পারি, যে-কথাই সেদিন বলে থাকি না কেন আজকের অনুভূতির তুলনায় তা অসম্পূর্ণ ছিল। দু'য়ের সম্পর্কের মধ্যে এমন কঠিনতর জট সেদিন স্বপ্নের আভাসেও জানিনি। আজ কোনো সরল উচ্ছ্বাসের স্থান নেই। অথচ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনটাও কেবল ইচ্ছাগত ও ভাবগত নয় একেবারে কোটরগত স্বার্থবুদ্ধিতেও ধরা পড়েছে। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধানকে কঠিন ক্ষুরধার শাণিত সংকল্পের অস্ত্রে কাটার দিন এসে গেল। ভারত উপমহাদেশকে তার ঐক্য, সংহতি ও সভ্যতার বেদীমূলে রক্ত দিতে হচ্ছে। শত-পাঁপড়ির একটি লাল-গোলাপ কাটায় ঘা না খেয়ে সহজলভ্য হবে না। বিনামূল্যে অর্জিত সম্পদের বুঝি মর্যাদাও থাকে না।

সকলে জানেন পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমি নিগৃহীতা হয়েছি। নিপীড়নের সেই দানবীয় শক্তি আজও প্রতিপাদিত না থাকলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ককে এমন বিষ করলো কারা? সেদিন যা ছিল ব্যক্তি মানবের উপর নির্যাতন, আজ তা দাবানল হয়েছে।

> আমরা ছিলাম কৃষক আন্দোলনের খুনের আসামী। ধরেই নিয়েছিলাম কোনো সরকার ভাগে-পাওয়া শ্রেণি শত্রুকে কনের আদর করবে না। কিন্তু বিচারহীন এবং মানবতাহীন যে উপরি রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতা সেদিন দেখেছিলাম তার কারণ ছিল অন্যত্র। পাকিস্তানী রাষ্ট্রনীতির অন্ধ বিবেচনায় আমরা অমুসলমানরা

কখনো পাকিস্তানের বিশ্বস্ত নাগরিক হবার যোগ্য নই। দৃষ্টির এই বিভ্রমই অসামজিক পাপকে উস্কিয়ে তুলেছিল। মুসলমান এবং অমুসলমানকে কিছুতে একত্রে দেখতে না পারার এবং সমান মর্যাদা স্বীকার করার এই পাতাল পুরীতেই এমন বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে যা থেকে কারুর পরিত্রাণ নেই। ভারত উপমহাদেশে অশান্তি ও অগ্নুৎপাতের মূলে সেই একই প্রক্রিয়া ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। এই পাপের মূলোচ্ছেদ ছাড়া কোথায়ও শান্তি নেই।

অথচ, সেই পাকিস্তানেরই মানুষ যাঁরা শাসিত হন শুধু তাঁরা নন, যাঁরা শাসনকার্য চালান তাঁদের শত-সহস্রে আমার মনকে যখন টানে, সেকি একটি মোহ?

আমার রক্তের মধ্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা মিশে রয়েছে। একথা ঠিক মাথার বন্দুকের কুঁদোর গুঁতা আমার শ্বাসনালি চিড়ে রক্তের ঝলক নামিয়েছে। নারীর অবমাননার রক্তপাতের কথাও কি ভাবে ভুলি এবং কেন-ই বা ভুলব? কিন্তু আমার রক্তশূণ্য পাণ্ডুর দেহ আবার যে প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে, তা আমি কোথায় পেয়েছিলাম? দোদণ্ড শাসকদের অত্যাচারের পাশে পাশে সেবা ভালবাসার যে হৃদয়গুলি আমাকে ঘিরে রয়েছে তাঁদের কথাও যে সমান সত্য। দিনের পর দিন আমার শিরায় বাইরের রক্ত জোগাতে হয়েছে। একথাটাও কিভাবে ভুলি সেই লাল জীবন মুসলমান ভাইদের দেহ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। রক্তের কোনো জাত আছে কিনা জানি না– যদি থাকে তবে আমি অবশ্যই জাতহীন।

এমন সভ্য দিন আজও আসেনি যখন সকলের নাম-ধাম প্রকাশ করে তাঁদের বিপদমুক্ত রাখা যায়। পাকিস্তানের রাজ কর্মচারীদের মধ্যেও অজস্র মানুষের সন্ধান পেয়েছিলাম যাঁরা ছাড়া আমাকে রক্ষার কেউ ছিল না। একটি দিন এবং একটি মানুষের মুখ বেশি মনে পড়ে। ধরা পড়ার পর পাশবিক অত্যাচারে আমি যখন স্মৃতিহীন, দৃষ্টিহীন বাকহীন। তাছাড়া পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে সামাল দিতেও আমার পুরোন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। উঁচুস্তরের রাজ কর্মচারীরা মনে করেছিলেন যে তাঁদের মন গড়া একটি বিবৃতিতে আমার স্বাক্ষর আদায় করে নেবার এটাই উপযুক্ত সময় হবে। সেই পুলিশী ব্যূহের মধ্যে শুধু একটি মাত্র মানুষ তার একটি মাত্র কথায় আমাকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমার কানে এই আদেশবাণী দিয়েছিলেন যে, 'ও রকমের কাগজে সই দিতে নেই।' যাবতীয় ব্যাখ্যার চেয়ে এই যে গম্ভীর একটি প্রত্যাদেশ সেদিন ঠিক তারই প্রয়োজন ছিল। মৃত্যুর পাশাপাশি জীবন ও সভ্যতার এই দূতেরা না থাকলে আমার জীবন অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।

অন্য একটি খবর যা আমি প্রত্যক্ষ দেখিনি, পরে শুনেছি। ঢাকা হাইকোর্টে আমাদের আপীলের বিচারে ব্যবহারের জন্য কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠা ব্যবহারজীবী একটি মুসাবিদা করেন। আমাদের জনৈক শুভানুধ্যায়ী তা নিয়ে রেলপথে ঢাকা যাচ্ছিলেন।

পথে সীমান্তের তল্লাসীতে তিনি ধরা পড়েন এবং পুলিশ অফিসার কাগজপত্রগুলি হস্তগত করে বাইরে নিয়ে চলে যান। আমাদের বন্ধু যখন গ্রেপ্তার হবার জন্যই সময় গুণছিলেন, তখন ট্রেন ঠিক ছাড়ার পর জানলা দিয়ে কাগজপত্রগুলি তাঁর কোলে এসে পড়ে এবং পুলিশ-অফিসার অন্তর্নিহিত হন। টাকার বিনিময়ে সীমান্তে হাতি পার করা যায়। কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত! টাকা পাওয়া দূরের কথা চাকরি হারিয়ে চিরজীবন ভিখিরি হবার ঝুঁকি এবং জেলভোগেরও যে বিপদ, তাকে উপেক্ষা করে এমন কাজ কে করেছিলেন? আমাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনে করুণা করেছিলেন তাতো নয়। তিনি আজও আমাদের সকলের অপরিচিত।

আজ আমি বেছে বেছে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদেরই অনুসরণ করছি বটে, কিন্তু পাকিস্তানের বিশাল জনতার মধ্যে আলোড়নের কথা বাদ দিলে এদের ব্যবহারের তাৎপর্যটা সবিশেষ স্পষ্ট হবে না। আমাদের মুক্তির জন্য পাকিস্তানে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল যার তুলনা বিরল। ফলে ছাড়া পাবার আগেই মুক্ত মানুষের মধ্যে আমি এমনভাবে মিশে যেতে পেরেছিলাম যা ছিল আরও চমকপ্রদ। ঢাকা হাসপাতালে তখন কড়া পাহারার বন্দি। তবু দলে দলে মানুষ দূর দূর গ্রাম থেকেও যখন হাসপাতালে উপস্থিত হতে থাকলেন, তখন আমার পাহারাদাররাই জনস্রোতের ধাক্কায় কোথায় তলিয়ে গেল এবং আমি সমুদ্রে মিশে গেলাম। এমনই একটি দিনে আমার স্বামী রমেন মিত্র যিনি আমাদেরই মামলার একনম্বর আসামী হয়ে পলাতক ছিলেন; তাঁকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। তিনি কিন্তু ধরা পড়েননি; পুলিশী পাহারাদারদের চেয়ে আরও বড়ো হুঁশিয়ারি ছাত্ররা তাঁকে নির্বিঘ্নে এনেছে এবং নিরাপদেই বের করে দিয়েছে। আমাদের মামলা একটি বিশেষ কারণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তা হল সরকারী সাক্ষীদের মধ্যে একজনও মুসলমান ছিলেন না। রাজকর্মচারীরা মুসলিম সমাজে দাঁত বসাতে না পেরে রাগ ও ক্ষোভের সব বিষ অসহায় বন্দিদের উপর ঝেরেছিলেন। এখানেই তাদের নৈতিক পরাজয় শুরু হয়েছিল। কাশ্মীরেও আজ তার প্রতিচ্ছবি দেখছি।

নিজেকে বারে বারে প্রশ্ন করেছি পাকিস্তানের এই যাঁরা নিজেরা ধার্মিক হয়েও ধর্মীয় রাষ্ট্রের উন্মত্ততাকে অস্বীকার করছেন এঁরা কারা? এরা কি পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুশমন? এরা কি বিদেশী চর? জবাবে পাকিস্তানের প্রতি তাদের ভালবাসার অন্ত নাই। এবং, ঠিক সেজন্যই পাকিস্তান থেকে মানবতা উচ্ছেদ হয়ে যাক কিংবা গণতন্ত্র উৎখাতে হোক, এই বিপদের বিরুদ্ধে তাঁরা দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছেন।

পাকিস্তান আজও আমার কাছে তীর্থভূমি। তীর্থ এজন্যই সেদেশের মানুষের সেই পরিচয়টা আমার বিশেষভাবে জানা, যারা মানুষে মানুষে বিদ্বেষের কূটনীতি ও রাজনীতির বিপদ মাথায় নিয়েও লড়তে জানেন। মানুষের প্রতি আস্থা রাখার এই বিরাট জোর আমি পাকিস্তানে পেয়েছি। যারা আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন তাঁরাই আমার গুরু।

নিঃসংশয়ে বলতে পারি ধর্মের ভিত্তিতে দ্বি-জাতিতত্ত্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে পাকিস্তানের।

আমাদের এই উপমহাদেশ মহামানবের তীর্থক্ষেত্ররূপে জন্মেছে, বেঁচেছে এবং বেড়েছে। ইংরেজ রাজত্বের আগে এদেশে মুসলমান সম্রাটদেরই দীর্ঘদিনের শাসন চলেছিল। ইতিহাসের সেই সময়েই পৃথিবীর সর্বত্র জাতীয় রাষ্ট্রের বুনিয়াদ তৈরী হয়। মুসলমান সম্রাটদেরও বিপুল অবদান ছাড়া এই ভারতভূমি কখনো একদেশত্বে দানা বাঁধতে পারতো না। ভারত উপমহাদেশের ঐক্যের সাধনা যদি লোপ পায় তবে সেই হতশ্রী ভারত উপমহাদেশের পৃথিবীতে কোন মর্যাদার ঠাঁই নেই। দ্বি-জাতিতত্ত্বে দেশ ভাগ করাটা নির্বুদ্ধিতা হয়েছিল কিনা সে বিতর্ক আজ নিরর্থক। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর কত রাষ্ট্রই তো দ্বিধাবিভক্ত হল। জাদরেল জার্মান জাতি দ্বিখণ্ডিত। কোরিয়া ইন্দোচীনও বিভক্ত। ভাঙ্গাগড়ার সংগ্রামে প্রত্যেক জাতির সমস্যা ভিন্ন, সমাধানও অনন্য। অথচ এরই মধ্যে সকল জাতির পারস্পরিক ঐক্যের টানও আজ এমন প্রবল যা আগে কোনোদিন ছিল না। দ্বিখণ্ডিত ভারত উপমহাদেশকেও এবার স্থির চিত্তে বুঝে নিতে হবে আরও ব্যবচ্ছেদ, আরও বিভেদ এবং আরও খণ্ডতা কেন করা হবে এবং তাতে স্বার্থই বা কার? স্বরাষ্ট্রের স্বদেশপ্রেমই এই প্রশ্নটিকে প্রধান করে তুলেছে। আঠারো বছরের সাবালক অভিজ্ঞতাও এই সত্যকে পরিষ্কার করেছে যে, আরও ভোগের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া ভারত ও পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রই জাতীয়তা ও মানবতা দানা বাঁধার অবকাশ পায় না।

এই ভাব ভাবনা এবং কাজ কিছুই নতুন নয়। ইতিহাসের পুরাতন কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের জীবনকালেই সেই প্রয়োজনকে আমরা মেনে নিয়েছি। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে বীজমন্ত্র করে নেওয়া ছাড়া ভারত কখনো এগুতে পারেনি। এমন কি দেশভাগের সময়ও আমাদের এই আকুতি প্রধান হয়ে উঠেছিল যে ভাইয়ে-ভাইয়ে সমঝোতা করে নিলে বিদেশীকে তাড়ানোর কাজটি নিশ্চিত করা যাবে। ইতিহাসের কাঁটাকে কি তবে আজ উল্টো পথে ঘুরতে দেওয়া হবে?

ভারত এবং পাকিস্তানের বিবাদে আজ যখন পাকিস্তানী শাসকেরা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদেরই কৃপাভিক্ষা করেন, সেখানেই ঘোরতর বিপাকের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষ থেকে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তির জন্য আবেদনকে অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানের শাসকেরা যখন জঙ্গীজোটের অংশীদার হন, বিপদ সেখানেই। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ রয়েছে। নিশ্চয় তা গুরুতরও বটে। কাশ্মীর ভারতের কাছে মোটেই একখণ্ড জমি মাত্র নয়। পাকিস্তানী শাসকরাও কাশ্মীরকে ভূমিখণ্ড বলে দাবি করছেন না। মুসলিম-প্রধান বলেই কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের দাবি। অপরদিকে ভারত কাশ্মীরকে হারালে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সাধনা থেকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। জোর করে কাশ্মীরের ব্যবচ্ছেদ সারা উপমহাদেশে নতুন করে হানাহানি কাটাকাটি, ভাগাভাগির জোয়ার আনবে। এই সংগ্রাম ভারতের কাছে জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম। অপরদিকে পাকিস্তানী শাসকেরা ঘোষণা করেছেন যে কাশ্মীর ছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্যই নাকি অসম্পূর্ণ রয়েছে।

এবার তাহলে সেই নির্মম মুহূর্তটাই ঘনিয়ে এল যখন পাকিস্তানের গণমতকেও সমগ্র বিষয়টাকে থিতিয়ে বুঝতে হবে। অভিজ্ঞতা মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। এই আঠারোটি বছর আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে। পাকিস্তানের মানুষকেও আজ পাতা উল্টে মিলিয়ে দেখতে হচ্ছে ধর্মীয় রাষ্ট্রের আওয়াজ এবং কূটকৌশল কি পাকিস্তানেরই গণতন্ত্র, মানবতা ও সহিষ্ণুতাকে সবচেয়ে বেশি দগ্ধ করেনি? পাকিস্তানেরই শত শত নাগরিকের ম্লানমুখেই সেই কালো দাগগুলি যে সবচেয়ে স্পষ্ট। তাঁরাই চেয়েছিলেন, আর ভাগাভাগি নয়; এবার ইলা মিত্রেরা সগৌরবে পাকিস্তানের নাগরিক হোক।

ইতিহাস বড়ো নির্মম। যা চাই তা এমনিতে পাওয়া যায় না। জীবনেরই আর এক সংগ্রাম। অবক্ষয়কে না ঠেকিয়ে অক্ষয়ের প্রতিষ্ঠা হয় না। পূর্ববাংলার আমার সেই পরিচিত ও অপরিচিত মানুষদেরও যখন স্মরণ করি তখন জানি যে হিন্দু হয়েও পাকিস্তানে থেকে সংগ্রাম করায় তাঁরা আমার মধ্যে যে 'কন্যা'কে খুঁজে ছিলেন, আজ তাঁদের নিজেদেরই আরও কতো বড়ো বীরের সংগ্রামে নামতে হচ্ছে। তাঁরা পাকিস্তানের নাগরিক। শাসকেরা যে দেয়াল গড়েছেন তাতে তাঁদের পিঠ ঠেকানো। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিষাদ তাঁরা নিজেরা দেখেছেন বলেই পাল্টা সংগ্রামে না নেমে তাঁদের পথ নাই। এই সংগ্রাম প্রথমে তাঁদের নিজেদের অন্তরের সঙ্গেই। ধর্মীয় রাষ্ট্রের ঝুটা আওয়াজের বদলে রাষ্ট্রের গণতন্ত্রীকরণেই সর্বমানবের মুক্তির ও ঐক্যের নিশান রয়েছে বলে তাঁদের ধর্মকে নতুন তারে বাঁধতে হচ্ছে। পূর্ব বাংলায় এরকমের মিছিল নামার সংবাদ যখন পাই তখন নিজেকে ধন্য মনে হয়, এমন বীরদের সান্নিধ্যেই আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় কয়েকটি বছর কাটাবার সুযোগ হয়েছিল।

তথ্যসূত্র: বইয়ের নাম: ইলা মিত্র, লেখক: মালেকা বেগম, প্রকাশকাল: ১লা বৈশাখ ১৩৯৪ প্রকাশক: মোতাহার হোসেন, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ৯২ আরামবাগ, ঢাকা–১২০৫

শহিদ দিবস ও গণ-আন্দোলন

ইলা মিত্র

২৪শে এপ্রিল। ১৯৫০ সালের এই দিনটিকে পূর্ব-পশ্চিম বাংলার গণতান্ত্রিক মানুষ বিশেষভাবে স্মরণ করে থাকে।

এই দিনটিকে উপলক্ষ করে পাকিস্তানে সমগ্র প্রদেশব্যাপী 'শহিদ দিবস' পালনের জন্য ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে। এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে–

আজ থেকে ১৪ বছর আগে, ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়াওয়ার্ডে এ দেশের বীর সন্তান সুখেন, দেলওয়ার, আনোয়ার, কম্পরাম, বিজন, হানিফ এবং সুধীন তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের পুলিশবাহিনীর গুলির আঘাতে প্রাণ হারান। ... আজ আমরা এই দুর্যোগের দিনেও সেই ১৯৫০ সালের শহিদদের আত্মদানকে স্মরণ করি শ্রদ্ধাভরে। তাঁদের সেই সুমহান আত্মত্যাগই হোক আমাদের জীবনের আদর্শ। এবং তাদের সেই রক্তাক্ত স্মৃতিকে স্মরণ করেই আমরা আজ দৃঢ় সংকল্পিত। তাই আমরা ২৪শে এপ্রিলকে 'শহিদ দিবস' স্বরূপ পালন করার জন্য সমগ্র দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাচ্ছি। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সময়কার শাসকচক্রের নির্মম অত্যাচার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক।

> শহিদ দিবসের কথা প্রসঙ্গে ১৯৪৭, '৪৮ ও '৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সেই অন্ধকারময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করি। সেই সময়ে দেশ বিভক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই লীগ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। শাসন ক্ষমতা লাভের পর আরম্ভ হয় লীগ সরকারের নৃশংস অভিযান। লীগ সরকার জনতার রুটি, রুজি, গণতন্ত্র, ভাষা ও স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে লাঠি, গুলি, বেয়নেট এবং জেল দ্বারা স্তব্ধ করতে চাইল। এবং শুরু হল শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের ওপর প্রচণ্ড দমননীতি। তখন শত শত দেশপ্রেমিক গণতন্ত্রকামী নেতা ও কর্মীদের বিনাবিচারে কারাগারে আটক করা হল। এদের মধ্যে মহিলাও ছিলেন। জেলের অভ্যন্তরে এই রাজবন্দিদের ওপর চলে অমানুষিক অত্যাচার।
>
> এই অত্যাচারের নির্ভীক প্রতিবাদে যে চেতনা মানুষের মনে জাগতে থাকে, সেটাই প্রকৃতপক্ষে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

১৯৪৮-৪৯ সালে রাজবন্দিদের দ্বারা যখন জেলগুলো পূর্ণ হতে লাগল তখন লীগ সরকার এক ঘোষণার দ্বারা রাজবন্দিদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা বাতিল করে দেয়। এবং রাজবন্দিদের তৃতীয় শ্রেণির কয়েদিদের মতো জেলে পুরে রাখে। এই নীতির প্রতিবাদে রাজবন্দিরা বিভিন্ন জেলে পর পর চার বার দীর্ঘস্থায়ী অনশন করেন। ফলে অধিকাংশ রাজবন্দির স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়লে জেল কর্তৃপক্ষ জবরদস্তি করে অনশন ভাঙ্গতে চেষ্টা করে। এই জবরদস্তিতে কয়েকজন রাজবন্দি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সময়ে রাজশাহী জেলার নাচোলে চলেছে কৃষকদের ফসলের দাবিতে 'তেভাগা' আন্দোলন। পুলিশ এ আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করলে, ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করে। এই এলাকার কৃষকরা প্রধানতঃ সাঁওতাল। পুলিশ কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্য যথেষ্ট গ্রেপ্তার করতে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দেয়। আর ১৫০ জনের ওপর কৃষককে গুলি করে হত্যা করে। এই নাচোলের কৃষকরা মৃত্যুবরণ করে গণ-আন্দোলন দৃঢ় ভিত রচনা করে যান। এই আন্দোলনকে রুখতে না পারার ফলে সরকারের কুটিল বুদ্ধি গণ-আন্দোলনকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাহায্য নেয়। রাজশাহী জেলের কর্তৃপক্ষ নাচোলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করে। জেলের ভেতরে হিন্দু বিদ্বেষ চরমে উঠতে থাকে। এই দাঙ্গা বন্ধ করবার দাবিতে হিন্দু-মুসলমান রাজবন্দিরা কয়েকদিন অনশন করতে বাধ্য হন।

ইংরেজ আমলে কয়েদিদের শায়েস্তা করবার জন্য যে সব প্রথা প্রচলিত ছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও সেগুলি চালু থাকে। এই প্রথাগুলি তুলে দেওয়ার দাবিতে সাধারণ কয়েদিরা অনশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সময় রাজবন্দিদের অনশনকে কেন্দ্র করে জেল আইন ভঙ্গ করে। এই সময় রাজবন্দিদের অনশকে কেন্দ্র করে জেল আইন ভঙ্গ করার অজুহাতে অনেককে বাৎসরাধিককাল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জেলকর্তৃপক্ষ রাজবন্দিদের জব্দ করার জন্য বিভিন্ন রকম দৈহিক পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করে। ১৯৫০ সালে সাধারণ কয়েদিরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য অনশন শুরু করলে রাজবন্দিরাও তা সমর্থন করে অনশনে যোগদান করেন। জেল কর্তৃপক্ষ পরে কয়েদিদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

সাধারণ কয়েদিদের মধ্যে রাজবন্দিদের প্রতি দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়তে থাকলে জেল কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাজবন্দিদের যথোচিত শাস্তি দেবে বলে শাসিয়ে যায়।

এর কিছুদিন বাদে (২৪শে এপ্রিল) জেল সুপার বিল সাহেব রাজবন্দিদের ওয়ার্ডে এসে হুকুম দিলেন যে, কয়েকজন রাজবন্দিকে অন্য ওয়ার্ডে যেতে হবে। রাজবন্দিরা প্রতিবাদ জানালে ঐ ওয়ার্ডের দরজায় তালা লাগিয়ে খোলা জানলা দিয়ে চারিদিক থেকে তাঁদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালান হলো। সে দিনের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে শহিদ হলেন ৭ জন রাজবন্দি। আহত হলেন অন্যান্য সকলেই।

নিরস্ত্র অসহায় বন্দিদের গুলি চালিয়ে হত্যা করে বিল সাহেব সেদিন ক্ষান্ত হননি। নিহত আহত বন্দিদের ওপর তিনবার লাঠি চার্জও করা হয়। মরবার সময় তরুণ ছাত্র নেতা সুখেন্দু ভট্টাচার্য বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বলে যান– 'বন্ধুরা, তোমরা যাহারা বেঁচে আছ বলিও, আমরা মারতে ভয় পাই নাই।' মৃত্যুর সময় কৃষকবন্ধু নেতা কম্পরাম সিং বলেন– 'সত্যের যে মহান পতাকা, তার সম্মান আমি অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিয়াছি– ইহাই আমার আনন্দ'।

পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, রাজশাহী জেলের হত্যাকাণ্ড তারই প্রধান অভিব্যক্তি। ১৯৪৮ সাল থেকে জনসাধারণ যেখানেই সামান্যতম দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছেন সেখানেই এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী লোকের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে, আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে, নিরপরাধ জনসাধারণ ও দেশপ্রেমিকদের হত্যা করে, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে সব আন্দোলন ব্যর্থ করবার চেষ্টা করেছে। ১৯৪৮ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাইকারী হারে লালকোর্তাদের হত্যা, চট্টগ্রামের মাদারামায় ১১ জনক কৃষক হত্যা, ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের উপত্যকায় বিপ্লবী হাজং কৃষকদের টঙ্ক প্রথার বিরোধী আন্দোলনে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার সংগঠিত হয় তারও বলি হয় ১০৩ জনের অধিক কৃষক। এছাড়াও সিলেটে, খুলনা, রাজশাহী, প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির আন্দোলনকারীদের ওপর যে পৈচাশিক আক্রমণ চলে সে ইতিহাস বর্বর যুগকেও অতিক্রম করে। এক নাচোলে পুলিশের গুলি চালনায় নিহত হয় ১৫০ জন কৃষক, গারো পাহাড় অঞ্চলে বেলুচ ফৌজের অত্যাচারে দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে আহার ও চিকিৎসার অভাবে প্রাণ দিয়েছিল ১৫০০ বেশি নরনারী। এদের মধ্যে নারী ছিলেন প্রায় ৪০০ জন। সিলেটের নানকার আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন পাঁচ জন।

চট্টগ্রামের চা-শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিক নেতা রবি দাসকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কৃষক আন্দোলনে হত্যা করা হয় ১৩ জনকে। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় পুলিশ বাহিনী বাঁচার দাবিতে ধর্মঘট করলে তাদের ওপর ফৌজ লেলিয়ে হত্যা করা হয় ২৫ জন তরুণ পুলিশ কর্মীকে।

> তার পরের ঘটনা, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকার ছাত্র সমাজ ও শ্রমিকেরা মিছিল বার করলো ঢাকার রাজপথে। সেই মিছিলের ওপর বর্বরের মত পাক-পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করলো সালাম, রফিক, বরকত, প্রমুখ ১৩ জন ছাত্র ও শ্রমিককে। ঢাকার এই আন্দোলন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ল সারা পূর্ব পাকিস্তানে।
>
> শাসকগোষ্ঠী এই দমননীতি দ্বারা যেমন বাইরের আন্দোলনে নৃশংস ও অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছেন, জেলের অভ্যন্তরেও সেই দমননীতি তারা বন্ধ করেননি! ময়মনসিংহে ও রাজশাহীতে বিচারাধীন বন্দিদের মধ্যে ৪০ জনেরও অধিক কৃষক জেলের অভ্যন্তরে নিদারুণ অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করেন। খুলনা জেলে মুগর পেটা করে হত্যা করা হয় বিষ্ণু বৈরাগীকে, বরিশালের জেলে কমিউনিস্ট কর্মী সুনীল দাস বন্দুকের কুঁদোর প্রহারে মৃত্যুবরণ করেন। ময়মনসিংহে জেলে মারা যান কমিউনিস্ট নেতা ফণী গুহ। পরের বছর ঐ জেলে যারা যান প্রায় ১৫ জন কৃষক। খুলনা জেলে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য হত্যা করা হয় কমিউনিস্ট কর্মী সামন্তি শেখকে। যশোর জেলে মারা যান কয়েকজন কৃষক কর্মী। মৃত্যুবরণ করছেন অনেকে। চরম দমননীতির মধ্যে অনেকে আত্মগোপন করেন এবং এইভাবে কাজ চলাকালীন সময়ে জীবন দান করেন অনেক কর্মী।
>
> তাদের মধ্যে আছেন রাজশাহীর কমিউনিস্ট নেতা শুভ্রাংশু মৈত্র, বরিশালের অমৃতলাল নাগ, ফণী চক্রবর্তী, ময়মনসিংহের ভূপেন ভট্টাচার্য, জহিরুদ্দিন, খুলনার ছাত্রনেতা বিষ্ণু ব্যানার্জী ও জানা-অজানা বহু দেশপ্রেমিক।

এভাবে বহু দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানে জেলের ভেতরে ও বাইরে আত্মাহুতি দিয়েছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে যাঁরা পুরোধা তাঁরা হলেন ২৪শে এপ্রিলের শহিদগণ। এঁরাই জনগণের মধ্যে আত্মত্যাগের প্রেরণা জাগিয়ে যান।

পাকিস্তানের লীগ সরকারের চরম দমননীতি কিন্তু গণ-জাগরণকে রোধ করতে সক্ষম হয়নি। অমর শহিদগণের অপূর্ব আত্মত্যাগ জনসাধারণকে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে

রুখে দাঁড়াতে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার প্রথম ফলশ্রুতি হলো ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জনবিরোধী লীগ সরকারের পরাজয়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণের এই রাজনৈতিক সাফল্যকে ঠেকানোর জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিক্রিয়াশীল সরকার রাষ্ট্রপতির শাসনক্ষমতা (সংবিধানের ৯২(ক) ধারার বলে) প্রয়োগ করে গণজাগরণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও গণ সমর্থনের জোরে কিছুকাল যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হয়। এই সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কিছুটা অগ্রগতি ঘটে এবং পাকিস্তানকে যুদ্ধজোটের কবল থেকে মুক্ত রাখবার জন্য একটা স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির সপক্ষে ও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীব্র-প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারি করে মওলানা ভাসানী ও খান আবদুল গফুর খানসহ হাজার হাজার দেশপ্রেমিককে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু আয়ুব খানের এই দমননীতির বিরুদ্ধে জনমত শান্ত না হয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই অবস্থায় আর অন্য কোনো পথ না পেয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা পূর্ব পাকিস্তানে আবার পার্লামেন্টারী শাসন চালু করতে বাধ্য হয়। এই সময় থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সাধারণ মানুষের কণ্ঠে দাবি ওঠে পূর্ণ গণতন্ত্র, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি ও জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নতি প্রভৃতি।

প্রতিক্রিয়াশীল সরকার সাধারণ মানুষের এই জাগরণকে রোধ করবার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর পরামর্শে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে একনায়কত্ব কায়েম করে। এবং ব্যাপকভাবে গণতন্ত্রকামী কর্মী ও জনসাধারণকে জেলে আটক ও রাজবন্দিদের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে। মুসলিম লীগের মত সামরিক শাসকরা নির্মম অত্যাচার, হত্যা, জেল ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণের মনে ভয় জাগিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে ভেঙ্গে দিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু জনসাধারণের গণতান্ত্রিক দাবি আদায়ের জন্য যে আত্মত্যাগের মন্ত্র নিয়েছেন তাকে বিফল করে দেবার শক্তি সামরিক শাসকদের নেই। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে যে তীব্র বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করেছে তার প্রত্যক্ষ পরিণতি ঘটে ছাত্র ও জনসাধারণ বনাম সামরিক বাহিনীর এক বৈপ্লবিক সংঘর্ষে। ১৯৪৮ সালের অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে যে গণমুক্তির উদ্বেল তরঙ্গ প্রবাহ হতে শুরু করে তাহা ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সংগ্রামী জনতাকে আরও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এই গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য গত জানুয়ারি মাসে আয়ুবশাহী সরকার সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করে এবং দাঙ্গার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিপথগামী করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। পূর্ব বঙ্গের গণতন্ত্রকামী জনসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আক্রান্ত সংখ্যালঘুদের জীবন রক্ষার জন্য এবং এতদিনের প্রতিষ্ঠিত গণজাগরণের চেতনাকে আরও সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনার জন্য পূর্ব বঙ্গের প্রগতিশীল মহাপ্রাণ

ব্যক্তিগণ জীবন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। সেদিন হিন্দুদের রক্ষার জন্য ৫০ জনেরও অধিক মুসলমান কর্মী আয়ুবশাহী প্রতিপালিত মুসলমান গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল পত্রিকাগুলি তাঁদের সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেরী করেনি। প্রতিটি প্রগতিশীল পত্রিকা দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে তীব্র জনমানস গঠন করে এবং দাঙ্গাবাজদের রুখে দাঁড়াতে নাগরিকদের প্রতি আন্তরিক আবেদন করতে থাকে। ফলে আয়ুব সরকার পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধ করতে বাধ্য হয়।

পূর্ববঙ্গের মানুষের দাঙ্গাবিরোধী মনোভাব সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রেখে গণতন্ত্রকে কায়েম করবার জন্য অটল পণ করে দুর্বার পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

১৮ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র শোভাযাত্রা, সভা এবং ১৯শে মার্চ সর্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি অবাঙালি মুসলিম অমুসলিম সর্বস্তরের মানুষের প্রাণে গণ-আন্দোলনের তরঙ্গ এসে বাজছে। সেই তরঙ্গাঘাতের প্রতিফলন দেখে আয়ুব সরকারের ভিত্তি কেঁপে উঠেছে। সুস্থ সম্প্রীতি বোধ সাধারণ মানুষকে পুনরায় অদমনীয় গণ-আন্দোলনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ১৯শে মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে পূর্ববঙ্গের মানুষের অনমনীয় সংকল্পই ঘোষিত হয়েছে মওলানা ভাসানীর কণ্ঠে। তিনি জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, "বাঙালী সম্রাট অশোককে মানেনি, মোগল পাঠানের অনুগত হয়নি, ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করেনি, কায়েদে আজমের মুসলিম লীগকেও সমর্থন করেনি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ায় জনতার রুদ্র রোষে সে মুসলিম লীগ আজ কবরে শায়িত। শেখ মুজিবুর রহমান ডাক দিয়ে বলেছেন, 'বাংলার ভায়েরা আমার। আপনাদের কাছে জেনে নিতে চাই... জেল জুলুমের মুখে আপনাদের ছেলেরা যেমন আজ বুক পেতে দিয়েছে, পারবেন কি আপনারা তেমনি করে ত্যাগ সাধনার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে?' পল্টন ময়দানে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ সেই জবাবে সাড়া দিয়ে উঠেছে।

১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল যে সাতজন অমর শহিদ তাঁদের বুকের রক্ত ঢেলে পাকিস্তানের গণতন্ত্রের পথ রচনা করেছিলেন সেই পথ ধরে আজ সে দেশের মানুষ এগিয়ে চলেছে। মানবিক প্রয়োজনে যাঁরা নিজের জীবন দিয়ে জনগণের দাবি আদায় করতে এগিয়ে গেছেন সেই সব অমর শহিদগণ জনসাধারণের চির নমস্য ও আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র। গণতন্ত্রকামী মানুষ তাঁদের এই অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরকাল স্মরণ করবে।

তথ্যসূত্র: বইয়ের নাম:'ইলা মিত্র, লেখক: মালেকা বেগম, প্রকাশকাল: ১লা বৈশাখ ১৩৯৪ প্রকাশক: মোতাহার হোসেন, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ৯২ আরামবাগ, ঢাকা–১২০৫

ইলা মিত্রের চিঠি

এ/৩ গভর্নমেন্ট হাউসিং
এস্টেট

কলিকাতা–১৪

১৯, ১১, ৮৬

প্রিয় মালেকা,

জয়ন্তীদির নিকট থেকে তোমার চিঠি ও সংবাদের কাটিং পেলাম। আমি ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রি করে 'গোলাম কুদ্দুস, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের' লেখা পাঠিয়েছি। আমার সম্বন্ধে লেখার ব্যাপারে তুমি– আমার মতামত জানতে চেয়েছে– সে সম্পর্কে প্রথমে দু'একটি কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী কবিতা গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে।

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলই করি অপমান
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে

কাজেই আমার পক্ষে কিরকম এমব্যারাসিং বুঝতেই পারছো।

তোমার প্রথম বিষয়ের উত্তর দিচ্ছি– মেসবাহ কামাল রচিত 'নাচোলে কৃষক বিদ্রোহ' প্রবন্ধে আমার শ্বশুর বাড়িতে আসারও কিছু পরে আমার কৃষ্ণ গোবিন্দপুর স্কুলে যোগদান সম্পর্কে তথ্য হচ্ছে এই যে নবজাতকে আমি লিখেছিলাম 'আমাদের বাড়ির চত্বরে বালিকা বিদ্যালয় খোলা হলো'– ওটা ঠিক চত্বর নয়– আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য কিছু দূরে– হেঁটে গেলে ৫ মিনিটের পথ– আমাকে অবশ্য গরুর গাড়িতেই যেতে হতো। যেখানে বিদ্যালয়টি খোলা হয়েছিল সেই স্থানটির নাম কৃষ্ণ গোবিন্দপুর। শুনেছি ঐ বিদ্যালয়টি এখন হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে।

তোমার দ্বিতীয় বিষয়– আমার সহকর্মী জেলবন্দিদের কথা–

আমি যখন প্রচণ্ড টরচার্ড হয়ে রাজশাহী জেলে প্রবেশ করলাম,

আমাকে রাখা হলো Solitary Confinement-এ একটি অন্ধকার ঘরে– শুধু আমার শোবার মতো সামান্য লম্বা চওড়া ঘর। সেই ঘরে অন্যান্য সাধারণ মেয়ে বন্দিরা ছিল।

সেই ফুটো দিয়ে ওদের দেখা যেত। ২/৩ দিন পর সেই ফুটোটাও বন্ধ করে দেওয়া হলো। আমি তখন প্রচণ্ড জ্বরে শয্যায়িত। আমি প্রায় এক বৎসর হল সলিটারি Confinment-এ ছিলাম। ঐ জেলের যে ডাক্তার ছিলেন তিনি আমাদের গ্রাম রামচন্দ্রপুর হাটের কাছাকাছি গ্রাম হরিশচন্দ্রপুরের বাসিন্দা ছিলেন। এবং আমাদের পরিবারকে চিনতেন। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। (নামটা আমার কিছুতেই মনে আসছে না)– নতুবা এ অবস্থায় আমি কিছুতেই বেঁচে উঠতে পারতাম না। প্রায় এক বৎসর আমি এ অবস্থায় ছিলাম। ১ বৎসর পরে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার মতো অবস্থায় এলাম তখন আমার ট্রায়াল– শুরু হলো।

ভালো করে হাঁটতে পারিনি তাই পুলিশ বেষ্টিত ঘোড়ার গাড়ীতে করে কোর্টে হাজির হলাম।

তারপর সেদিনই যখন ফিরে জেলে আসছি তখন এক প্রকার জোর করে। ঐ হল ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম যেখানে অন্যান্য রাজবন্দি মেয়ে এবং সাধারণ মেয়ে কয়েদিরা ছিল। তারপর আর আমাকে ঐ Solitary Confinement যেতে হয়নি। অন্যান্য রাজবন্দি মেয়েরাও এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করলেন– নতুবা আবারও আমাকে ওখানে ঢুকতে হতো। সেখানে আমি পেলাম বরিশালের মনোরমা বসু, পুতুল দাস গুপ্ত ও সুজাতা দাস গুপ্তকে খুলনার ভানু দেবীকে, পাবনার লিলি চক্রবর্তীকে, সিলেটের অমিতা দেব, সুষমা দে, অর্পণা রায় চৌধুরীকে, ময়মনসিংহের অসনিগুপ্ত, ও ভদ্রমণি হাজং ও নওগাঁর রেখাকে, আর দু'জনের নাম মনে পড়ছে না, আমাকে নিয়ে আমরা ১৪ জন রাজবন্দি ছিলাম। এরা সর্বতোভাবে আমাকে সবদিক দিয়ে সাহায্য করেছেন যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ভানুদি জেলে আমার রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। নানাভাবে গল্প করে আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি এবং মাসীমা (মনোরমা বসু) আমাকে বললেন– কোর্টে উপস্থিত হয়ে আমি যেন আমার উপর Torture হয়েছে– তার একটি পূর্ণ বিবৃতি দিই। আমি হিন্দু মেয়ে কমিউনিস্ট হলেও তো একেবারে সংস্কার মুক্ত হইনি।

বয়স তখন মাত্র ১৫ বৎসর– আমি যদি পূর্ণ বিবৃতি দিই– হিন্দু সমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না এ আশঙ্কা ছিল। কাজেই খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু ভানুদি আমাকে অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় বললেন যে, আমি প্রথম দিনই যদি এই বিবৃতি না দিই তবে আমার পার্টি মেম্বারশিপ যাতে না থাকে পার্টিকে লিখে তিনি সেই ব্যবস্থা

করবেন। এবং আমাকে এক ঘরে করে রাখবেন। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত আমি বিবৃতি দিলাম।

সেই বিবৃতিটা বোধহয় তোমরা পেয়েছ। বদরুদ্দীন ওমর কিংবা আর কারও বইতে ঐ বিবৃতি আমি দেখে ছিলাম।

কলকাতায় এখন অর্পনা দি, পুতুল দাস, সুমাতা ও অনিতা আছে। ভানুদি, মনোরমা বসু, সুষমা দে ও অসমনি হাজং রেখা মারা গেছেন।

ভদ্রমণি বা লিলির খবর জানি না।

এরা সকলেই আমাকে সেবাযত্ন উপদেশ স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে আমার শিরদাঁড়াকে সোজা রাখতে সাহায্য করেছিলেন। জেলের মধ্যে অর্পনাদি তো অসুস্থই ছিলেন। পেটের ব্যথা লাঠি দিয়ে হাঁটতেন! ভানুদি জেলের মধ্যে ভুল চিকিৎসার জন্য প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হলেন। আমি একটু সুস্থ হতে না হতেই প্রথমেই টাইফয়েড পরে কালাজ্বরে আক্রান্ত হলাম। সে সময়ে মাসীমা ও লিলি দিনরাত্রি জেগে আমার সেবাযত্ন করতেন। ওদের ঐ সেবাযত্ন না পেলে আমাকে আর বেঁচে উঠতে হতো না।

সম্প্রতি কাগজে দেখলাম মনোরমা মাসীমা মারা গেছেন। খুবই খারাপ লাগছে। ৩০শে নভেম্বর আমরা এখানে একটি সর্বদলীয় জনসভা করেছি। তোমার ওখানে তো অনেক সভাই হবে। তোমার তৃতীয় বিষয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। ১৯৪৩ সালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে উঠে দুর্ভিক্ষের সময়। আমরা (কলিকাতায়) তখন relief-এর কাজ করেছি ও লঙ্গরখানা খুলে খিচুড়ি রেঁধেছি।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে কাজ করেছি। কমলা মুখার্জী ও মণিকুন্তলা সেন আমার পার্টি সদস্য পদের জন্য recomment করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে কলকাতার পার্টি সদস্য পদ পাই।

৪র্থ বিষয়:– গোপন চিঠি আসেনি। কোর্টে যেদিন উপস্থিত হলাম সেদিন Solitary Confinement-এ না গিয়ে আমি তো তখন ওদের সঙ্গেই ছিলাম ও আলাপ আলোচনা করতাম। যদিও অনেক কথা ভুলে গিয়েছিলাম Solitary Confinement থেকে Nervous break dawn- হয়েছিল। সে সময়ে জেল সাথীরা আমাকে প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করেছিলেন।

আমার উকিল ছিলেন রাজশাহীর শ্রী বীরেন সরকার এবং আরো অনেকে। পরবর্তী আপিলের সময় উকিল ছিলেন কুমিল্লার কামিনী দত্ত কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন ইউসুফ জামাল এবং অন্যান্য। আমি যেরূপ নির্যাতিত হয়েছিলাম আমার কৃষক সাঁওতালরাও তার চেয়ে কম নির্যাতিত হয়নি। আমাকে প্রথমে নাচোল

থানায় রাখা হয়েছিল। তারপর নবাবগঞ্জ থানায় তারপর রাজশাহী জেলে। নবাবগঞ্জ থানায় গিয়ে দেখলাম সমস্ত কৃষক সাঁওতালদের উপরে প্রচণ্ড নির্যাতন চলছে। আমাকে একটি সেলে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে তাদের Tourture ও মৃত্যু নিজের চোখে দেখলাম। পুলিশ বুটের লাথি মারতে মারতে মেরেই ফেললো হরেক প্রভৃতি কয়েকজনকে, কিন্তু তবু তারা আমার নাম করলো না– পুলিশদের জিজ্ঞাসা ছিল 'বল রাণী মা-ই তোদের পুলিশ খুন করার হুকুম দিয়েছিল' কিন্তু তারা একবারও আমার নাম উচ্চারণ করেনি– মার খেতে খেতে মরে গেছে কিন্তু তাদের মুখ থেকে আমার নাম উচ্চারিত হয়নি। এ যে আমার কাছে কতবড় শিক্ষা– লিখে ভাষায় বোঝাতে পারবো না। আমাদের এই তেভাগা আন্দোলন হিন্দু মুসলমানদের মিলিত আন্দোলন ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপারে আমাদের Case-এ একজনকেও পুলিশ রাজসাক্ষী করতে পারেনি।

আমার সাথে কমরেড বৃন্দাবন সাহাও ধরা পড়েছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত Tortured হয়েছিলেন। অন্য স্থান থেকে নেতাদের মধ্যে আরও একজন ধরা পড়েছিলেন তার নাম কমরেড অণিমেষ লাহিড়ী।

তোমার পঞ্চম বিষয়– প্যারোলে মুক্তিতে আলম সাহেবের অবদানের কথা জীবনে ভুলবো না। তিনি সাথে করে আমাকে কলকাতায় নিয়ে এসে কলকাতা মেডিকেল কলেজে তুলে দিয়েছিলেন। সেটা ১৯৫৪ সাল– ৮ মাস মেডিকেল কলেজে ডা. শিশির মুখার্জীর অধীনে চিকিৎসাধীন থাকি। তখনও হাঁটতে পারি না। তারপর স্বামী পুত্রসহ ১ বৎসর ঘাটলীলায় থাকি। ৭ বৎসর পর ছেলের সাথে দেখা হয় সেখানে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে হাঁটতে থাকি। তারপর ফিরে আসি কলকাতায় ও বেহালায় বস্তী বাড়ি একটি ঘর ভাড়া করে। আমি স্বামী পুত্রসহ বাস করতে থাকি। জীবিকা কিছু ছিল না– পার্টি কিছু অর্থ সাহায্য করতো। এই সময় আমি জীবিকার জন্য অনুবাদ লিখতে থাকি। ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে বি. এ পাশের ১৩ বৎসর পরে প্রাইভেটে এম.এ পাশ করি ১৯৫৮ সালে। সিটি কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেই। কেবলমাত্র জীবিকার জন্য। আমার স্বামী রমেন মিত্র সব সময়ই আমার প্রেরণা, তিনি এখানকার Party-র wholetimer রূপে কাজ করতে লাগলেন।

সর্বশেষ প্রশ্নের জবাবঃ– A Girl from History আমার অনূদিত বই– জেলখানার চিঠি, হিরোশিমার মেয়ে, Heart and Soul দু'খণ্ড অনুবাদ মনে প্রাণে, লেনিনের জীবনী, রাশিয়ার ছোট গল্প ইত্যাদি। হিরোশিমার মেয়ে এ বইটির জন্য সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহেরু পুরস্কার পেয়েছি।

কাজের অভিজ্ঞতা ও নারী আন্দোলন সম্পর্কে পরে লিখবো ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে আত্মগোপনকালীন সময়েই আমি কলকাতায় আসি ও মেডিকেল

কলেজে আমার ছেলে মোহনের ১৯৪৮ সালের ৬ই মার্চ জন্ম হয়। ১৬ দিন পর শাশুড়ী কলকাতা থেকে মোহনকে রামচন্দ্রপুরের বাড়িতে নিয়ে যান। আমিও নাচোলে ফিরে যাই Underground-এ থাকি।

জেল থেকে ফেরার পর ৭ বৎসর বয়সের সময় মোহনের সাথে আমার দেখা হয়। আমার শাশুড়ী ওকে দেখাশোনা করতেন। উনি রামচন্দ্রপুরে একাই আমার ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। আমাদের বাড়িঘর বাজেয়াপ্ত হলে ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। অসম্ভব মনোবলের মানুষ। কিছুতেই বাড়ী ছাড়তে চাননি। চাকুরী পাবার পর আমি যখন বাদুড় বাগান স্ট্রীটে বাড়ি ভাড়া করে থাকি– উনি আমাদের কাছেই ছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। ১৯৬২ সালে চীন আক্রমণের সময় আমি যখন এখানকার জেলে তখন তার মৃত্যু হয়। মোহনের ভাল নাম রণেন। বৌয়ের নাম সুকন্যা।

ঢাকার হাসপাতালে থাকাকালীন ছবিগুলির Copy করা এখনও হয়ে উঠেনি। পরে পাঠাবো।

আশা করি তোমরা ভাল আছ, আমরা একরকম আছি।

তোমরা আমাদের প্রীতি ভালবাসা নিও

ইলা দি

২০, ১১, ৮৬

পরিশিষ্ট–১

বিপ্লবী ইলা মিত্র

শেখ রফিক

রাজশাহী আদালতে ইলা মিত্র ইংরেজিতে লিখিত যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন তা থেকে তার ওপর যে অত্যাচার হয়েছে সে বিষয়ে জানা যায়। তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন, 'বিগত ০৭ জানুয়ারি ১৯৫০ তারিখে আমি রোহনপুর থেকে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোল থানা হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। কিন্তু পথে পাহারাদার পুলিশরা আমার ওপর অত্যাচার করে। নাচোলে ওরা আমাকে একটা সেলের মধ্যে রাখে। সেখানে একজন পুলিশের দারোগা আমাকে এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, আমি যদি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি না করি, তাহলে ওরা আমাকে উলঙ্গ করবে। আমার যেহেতু বলার মত কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার পরনের সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সেলের মধ্যে আটকে রাখে।

আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি। এমন কি এক বিন্দু জলও না। ওই সন্ধ্যায় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এসআইএ'র উপস্থিতিতে সিপাইরা এসে বন্দুকের বাট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময় আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এরপর ওরা আমার পরনের কাপড়-চোপড় ফেরত দেয়। রাত প্রায় বারোটার সময় আমাকে বের করে সম্ভবত এসআইএ'র কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আমি খুব বেশি নিশ্চিত ছিলাম না। আমাকে যে কামরায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে আমার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ওরা নৃশংস ধরনের পন্থা অবলম্বন করে। আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে ওরা আমার পা দুটোকে লাঠির মধ্যে রেখে ক্রমাগতভাবে চাপ দিতে শুরু করে। ওদের ভাষায় আমার বিরুদ্ধে 'পাকিস্তানী ইনজেকশন' পন্থায় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল। এ ধরনের অত্যাচার চলার সময় ওরা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে রেখেছিল এবং আমার চুল ধরেও টান দিচ্ছিল। কিন্তু আমাকে দিয়ে জোরপূর্বক কিছুই বলাতে সক্ষম হয়নি। এতসব অত্যাচারের দরুণ আমার পক্ষে আর হেঁটে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে নিয়ে গেল। এবার পুলিশের সেই দারোগা সিপাহীদের ৪টা গরম ডিম আনার নির্দেশ দিয়ে বলল যে, এবার মেয়েটাকে কথা বলতেই হবে। তারপর শুরু হলো নতুন ধরনের অত্যাচার। ৪/৫ জন সিপাহী মিলে জোর করে আমাকে চিৎ হয়ে শুতে বাধ্য করলো এবং ওদের একজন আমার গোপন অঙ্গ দিয়ে একটা ডিম ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। সে এক ভয়াবহ জ্বালা। প্রতিটি মুহূর্ত অনুভব করলাম, আমার ভিতরটা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে।

আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ১৯৫০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সকালে আমার জ্ঞান ফিরে এলো। একটু পরে জনাকয়েক পুলিশ সঙ্গে করে আবার সেই দারোগার আগমন ঘটে।

সেখে ঢুকেই সে আমার তলপেটে বুট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারে। আমি দারুণ ব্যথায় কুঁকড়ে গেলাম। এরপর ওরা জোর করে আমার ডান পায়ের গোঁড়ালি দিয়ে একটা লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দিল। আমি তখন অর্ধ-চৈতন্য অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছি। কোনো রকম স্বীকারোক্তি না পেয়ে দারোগা তখন রাগে অগ্নিশর্মা। যাওয়ার আগে বলে গেল, আমরা আবার রাতে আসবো। তখন তুমি স্বীকারোক্তি না দিলে, একের পর এক সিপাহী তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাতে দারোগা আর সিপাহীরা আবার এলো এবং আবারো হুমকি দিল স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য। কিন্তু আমি তখনও কিছু বলতে অস্বীকার করলাম। এবার দু'জন মিলে আমাকে মেঝেতে ফেলে ধরে রাখলো এবং একজন সিপাহী আমাকে রীতিমতো ধর্ষণ করতে শুরু করলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম...।" *(সূত্রঃ ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, মুক্তিমঞ্চে নারী, প্রিপ ট্রাস্ট, ১৯৯৯, ঢাকা)।*

ইলা মিত্রের জন্ম ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতায়। জন্মের পর তার নাম রাখা হয় ইলা সেন। রমেন্দ্র মিত্রের সাথে বিবাহ হওয়ায় তার নাম হয় ইলা মিত্র। এই নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অধীন বাংলার একাউনটেন্ট জেনারেল। ইলা মিত্রের আদি বসতো ছিল ঝিনাইদহের বাগুটিয়া গ্রামে। বাবার চাকুরির কারণে তারা কলকাতায় বসবাস করতেন। কলকাতা শহরেই ইলার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অনেকটা সময় কাটে। লেখাপড়া হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর কলকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজে। কলেজ শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন।

পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি খেলাধুলায়ও তুখোড় ছিলেন। ১৯৩৫-৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাজ্য জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ন। সাঁতার, বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন খেলায়ও তিনি ছিলেন বেশ পারদর্শী। তিনিই প্রথম বাঙালি মেয়ে যিনি ১৯৪০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত হন। যুদ্ধের জন্য অলিম্পিক বাতিল হয়ে যায়। খেলাধুলা ছাড়াও গান, অভিনয়সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। ১৯৩৬-৪২ সালের মধ্যে ইলা মিত্রের নাম সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইলা মিত্র বেথুন কলেজে পড়াশুনা করার সময়ে নারী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতা মহিলা সমিতির সদস্য হন। হিন্দু কোড বিল এর বিরুদ্ধে মহিলা সমিতির আন্দোলনে তিনি একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকাবস্থায় তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

১৯৪৫ সালে ইলা মিত্রের বিয়ে হয় বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা রমেন্দ্র মিত্রের সাথে। বিয়ের পর কলকাতা ছেড়ে চলে এলেন শ্বশুরবাড়ি রামচন্দ্রপুর হাটে। রক্ষণশীল জমিদার পরিবারের নিয়মানুসারে অন্দরমহলেই থাকতেন ইলা মিত্র। এই সময় রমেন্দ্র

মিত্রের বন্ধু আলতাফ মিয়া কৃষ্ণগোবিন্দপুর হাটে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খুলেন। রমেন্দ্র মিত্রের কাছে গ্রামের সবাই দাবি জানালেন তাদের নিরক্ষর মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব নিতে হবে বধূমাতা ইলা মিত্রকে। অনুমতি পেল ইলা মিত্র। মাত্র তিনজন ছাত্রী নিয়ে স্কুলটি শুরু হলো। তিনমাসের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০/৫০ জনে।

স্বামী রমেন্দ্র মিত্রের কাছে তিনি জমিদার ও জোতদারের হাতে বাংলার চাষীদের নিদারুণ বঞ্চনা, শোষণ এবং শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলনের কাহিনী শোনেন। অনেক পূর্বে কমিউনিস্ট রমেন্দ্র মিত্র জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে পারিবারিক ঐতিহ্য ও মোহ ত্যাগ করে কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। রমেন্দ্র মিত্র ইলা মিত্রকে এসব কাজে উৎসাহ দেন। ১৯৪৬-৫০ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর নবাবগঞ্জ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ইলা মিত্র।

কৃষক জমির মালিক নয়, তাই উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দিতে হতো জোতদারদের হাতে। এ ব্যবস্থাকে বলা হতো 'আধিয়ারী'। জোতদারি ও জমিদারি প্রথা ক্ষুদ্র কৃষকদের শোষণের সুযোগ করে দেয়। খাজনা আদায়ের জন্য জোতদাররা এদেরকে দাসের মতো ব্যবহার করে। চালাতো নিপীড়ন, নির্যাতন। অনেক সময় খাজনা না দিলে কৃষকদের মেয়ে-বউ ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে মৃত্যুমুখে ছেড়ে দিত। খাজনা পরিশোধ করার জন্য কৃষকেরা মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হতো। যার ফলে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে আধিয়ার আর ক্ষেত মজুরে পরিণত হয়।

এ শোষণ কৃষকের মনে বিক্ষোভের জন্ম দেয়। যার ফলে ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় 'সর্বভারতীয় কৃষক সমিতি'। ১৯৪০ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার উদ্যোগে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব দেয় 'ফাউন্ড কমিশন'। এই কমিশনের সুপারিশ ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে চাষীদের সরাসরি সরকারের প্রজা করা এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দুইভাগের মালিকানা প্রদান করা। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কৃষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। চল্লিশের দশকে এসব আন্দোলনে ইলা মিত্র নেতৃত্ব দেন। ১৯৪২ সালে সমগ্র বাংলায় দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এ সময় কৃষকের ওপর শোষণের মাত্রা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তিনভাগের দুইভাগ ফসল, কৃষকের এই দাবি নিয়ে বেগবান হতে থাকে তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৬-৪৭ সালে দিনাজপুরে কমরেড হাজী দানেশের প্রচেষ্টায় সংগঠিত হয় যুগান্তকারী তেভাগা আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি চাষীদের সংগঠিত করে আন্দোলনকে জোরদার করতে থাকে। পার্টি থেকে রমেন্দ্র মিত্র ও ইলা মিত্রকে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কৃষক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে তেভাগা আন্দোলনকে জোরদার করতে বলা হয়। ১৯৪৬ সালে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় সেবা ও পুনর্বাসনের কাজ করতে এগিয়ে আসে। এসময় ইলা মিত্র নোয়াখালীর দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রাম হাসনাবাদে পুনর্বাসনের কাজে চলে যান।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর মিত্র পরিবারের জমিদারি অঞ্চল রামচন্দ্রপুর হাট পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান হবার পরও তেভাগা আন্দোলন

অব্যাহত থাকে। পূর্ব-পাকিস্তানের অনেক স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন হয়। মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানের এই আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করে। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে। পার্টির শীর্ষ নেতারা আত্মগোপন করে কাজ করতে থাকেন। ইলা মিত্র ও রমেন্দ্র মিত্র নাচোলের চণ্ডীপুর গ্রামে আত্মগোপন করেন। আত্মগোপন অবস্থায় তারা চণ্ডীপুর গ্রামে এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯৪৮ সাল। ইলা মিত্র অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান প্রসবের জন্য তিনি গোপনে কলকাতায় যান। পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।

এক মাস বয়সের ছেলেকে শাশুড়ির কাছে রামচন্দ্রপুর হাটে রেখে তিনি আবার ফিরে আসেন নাচোলে। ১৯৪৯ সালে তার নেতৃত্বে হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক সংগঠিত হয়। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে জোতদার, মহাজনদের দল। ওই বছর কৃষকের ধান জোতদারদের না দিয়ে সরাসরি কৃষক সমিতির উঠোনে তোলা হয়। ফলে সংঘর্ষ বাঁধে। নাচোলে সাঁওতাল ও ভূমিহীনদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক শক্তিশালী তীরন্দাজ ও লাঠিয়াল বাহিনী। এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন মাতলা মাঝি। এভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন ইলা মিত্র ও রমেন্দ্র মিত্র। নাচোল অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের বাস্তব রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন তারা। ১৯৫০ সালে জোতদার ও ভূমি মালিকেরা নাচোলের ভিতর এবং আশেপাশে তেভাগা কার্যকর করতে বাধ্য হয়। সরকারের পুলিশ বাহিনী গ্রামে গ্রামে অভিযান চালিয়ে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি পুলিশ বাহিনী চণ্ডীপুর গ্রামে আসে। গ্রামবাসী সংগঠিত হয়ে পুলিশ বাহিনীকে পাল্টা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে উত্তেজিত গ্রামবাসী ওই পুলিশ কর্মকর্তা ও পাঁচ জন পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করে। এই ঘটনার দু'দিন পর ৭ জানুয়ারি শুরু হলো পুলিশের প্রতিশোধ। দুই হাজার সেনা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযান শুরু করে। বারোটি গ্রাম ঘেরাও করে তছনছ করে। ঘরবাড়ি ধ্বংস করে। গুলি চালিয়ে হত্যা করে অসংখ্য গ্রামবাসীকে। নারীদের ধর্ষণ করে। শিশুদের চালায় যৌন নির্যাতন। আন্দোলনকারী নেতা-কর্মীরা যে যার মতো আত্মগোপনে চলে যায়। ইলা মিত্র ৭ জানুয়ারি সাঁওতাল বেশ ধারণ করে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ভারত সীমানা পার হওয়ার সময় তিনিসহ আরো অনেক নেতা-কর্মী রোহনপুর রেলওয়ে স্টেশনে ধরা পড়ে যান। তাদের ধরে আনা হয় নাচোল স্টেশনে। পুলিশ তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। এই অত্যাচারে ইলা মিত্রের সাথীদের মধ্যে আনুমানিক ৮০/৯০ জন মারা যায়।

কমরেড ইলা মিত্রের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হলো। পুলিশ অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে তার স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে। টানা চার দিন অত্যাচারের পর নাচোল স্টেশন থেকে ইলা মিত্রকে নবাবগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে আনা হয়। সে সময় তার শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। গায়ে ছিল প্রচণ্ড জ্বর। ইলা মিত্রের ওপর বাঁশকল, শরীরের নাজুক অংশে বুটের আঘাত, বিবস্ত্র করে প্রহার, অনাহারে রাখা, ধর্ষণ ইত্যাদি ধরণের অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়।

এরপর ইলা মিত্র, রমেন্দ্র মিত্র ও মাতলা মাঝিকে প্রধান আসামী করে এবং শতাধিক সাঁওতাল কৃষকের বিরুদ্ধে 'পুলিশ হত্যা মামলা' দায়ের করা হয়। মামলাটি রাজশাহী কোর্টে উঠে। এটাই কুখ্যাত 'নাচোল হত্যা মামলা'।

নাচোল হত্যা মামলা কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী না থাকায় রাজশাহীর তৎকালীন দায়রা জজ প্রধান তিন আসামীকে দোষী প্রমাণ করে যাবজ্জীবন ও ১০৭ জন কৃষককে হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতার দায়ে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়। ইলা মিত্রকে রাজশাহী জেলে পাঠায়। এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করা হলে শাস্তির মেয়াদ ১০ বছর কমিয়ে দেয়া হয়।

১৯৫৩ সালে তাকে ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর করা হয়। কমরেড ইলা মিত্র ও তার সহযোদ্ধারা তখন ছাত্র জনতার চোখে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র।

সাধারণ মানুষ তাকে ছেড়ে দেয়ার দাবি করে রাজপথে নেমে আসে। ১৯৫৪ সালে কমরেড ইলা মিত্রকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আনা হয়। ওই বছর যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হলে মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের নির্দেশে ইলা মিত্রের ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য একটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। এই টিমের সুপারিশে বলা হয়, 'ইলা মিত্র' নানা ধরণের দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত। মুখ্যমন্ত্রী এই সুপারিশের ভিত্তিতে নির্দেশ দেন, 'নাচোল হত্যা মামলার অন্যতম সাজাপ্রাপ্ত আসামী ইলা মিত্রকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেয়া হোক'।

চিকিৎসা হলো। সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি। তখন থেকেই শুরু হয় জীবনের নতুন অধ্যায়। সুস্থ হয়ে তিনি কলকাতা সিটি কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত হন। ১৯৮৯ সালে তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি ইলা মিত্র পশ্চিমবঙ্গের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির জেলা ও প্রাদেশিক কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৯৬২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি চারবার মানিকতলা নির্বাচনী এলাকা থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৭-৭২ সালে বিধান সভায় কমিউনিস্ট ডেপুটি লিডার ছিলেন। ১৯৬২-০২ পর্যন্ত শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে তিনি পাঁচবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন আন্দোলনের জন্য ১৯৬২, ৭০, ৭১ ও ৭২ সালে কারাগারে যেতে হয়েছে তাকে। ইলা মিত্র ভারতের মহিলা ফেডারেশনের জাতীয় পরিষদ সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সহ-সভানেত্রী এবং ভারত ও সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির সহ-সভানেত্রী ছিলেন। বাংলাদেশের মানুষের জন্য তার ছিল বিশেষ আন্তরিকতা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন।

ইলা মিত্র কলকাতায় স্বামী রমেন্দ্র মিত্র, একমাত্র পুত্র রণেন মিত্র, পুত্র বধূ ও নাতি-নাতনিকে নিয়ে জীবনের শেষ সময় কাটিয়েছেন। উপমহাদেশে নারী জাগরণ ও কৃষক আন্দোলনের এই কিংবদন্তি নেত্রী ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর মারা যান।

তথ্যসূত্র: বইয়ের নাম: শত বিপ্লবীর কথা, সম্পাদক: শেখ রফিক, প্রকাশকাল: ২০১২, মূল্য: ৭৫০, প্রকাশক: বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা, মুক্তি ভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

Comrade Ila Mitra

Dr Ajoy Roy

The legendary Ila Mitra (1971), the leader of the Tebhaga movement of 50s, the legendary peasant leader of undivided Bangla, a veteran leader of the communist movement in the sub-continent, a dedicated friend to the cause of our war of liberation in 1971, breathed her last in Kolakata on Sunday, 13th October afternoon at PG hospital, Kolkata, West Bangla. It was learnt from ETV-Kolkata TV channel that following a severe heart attack some time back she had been under treatment in the PG hospital. She was 77. I remember her today with due respect and solemnity.

In Rajshahi district, Nachol, a police station at that time of greater Rajshahi became the centre of peasant movement, known as Tebhaga Andolan in the district. Ila Mitra, an athlete of no mean caliber before she was married to a zaminder son of that locality, deeply got involved in the movement encouraged by his husband and ultimately became 'Rani Ma' (queen-mother) of the peasants of the locality. But who is Ila Mitra to the present generation, particularly of Bangladesh? Does the name bear any significance to them? Perhaps not.

6

Who is Ila Mitra?

Ila Sen, her maiden name, was a daughter of a simple middle class government service holder. Their original home was at the village named Bagutia in the then Jenidah Subdivision of Jessore district. Her father, Nagendra Nath Sen was an accountant of AGB office, Kolkata when Ila was born on 18 October 1925. She completed her education at Kolkata- studying at Bethun School and College under Calcutta University. She passed BA with honors in Bangla literature in 1944. She finally obtained her MA degree in Bangla literature and culture from Calcutta University as a private candidate in 1958 after long 13 years of passing BA. Why? That is part of her story.

It might appear strange to many of us such a political personality was a champion athlete in her school and college days. In the

decade of thirties she was a star woman in the world of sports in Bangla. She was junior champion athlete in Bangla Presidency from 1935-1938. She was a good basketball player too. She was selected to represent India in athletics in Olympic games scheduled to be held in 1940 in Japan, which however could not be held because of World War II. In 1944, she got married to Ramendra Nath Mitra, son of a zemindar family of Ramchandrapur, then under Maldah district of British Bangla adjacent to present district of Nawabganj in Bangladesh. Ramendra however not only a son of a Zemindar family, but himself an organizer of the communist movement in Maldah. He was a district president of Peasant Association.

Ila Mitra's Political association

Through marriage she first became aware of the peasant movement in northern region of undivided Bangla. But even before her marriage she got involved with politics of left through Students Federation, a left oriented students' organization and Women Self Defense Association (Mahila Atama Raksha Samity). She became very much active in communist movement in early forties, as a result of which she got the membership of Communist Party of India (CPI) at the age of only 18 years. After marriage she moved to Ramchandrapur as a newly married bride of a conservative traditional Hindu family. The couple had their only son born in 1948, while Ila Mitra was organizing peasant movement in the locality of Nachol under the directives of CPI.

Tebhaga Movement

Ila Mitra came to prominence during 1948, just after partition of Bangla in 1947 for her revolutionary leadership to peasant movement, popularly known as 'Tebhaga Andolan', as we mentioned earlier. The Banglai word 'Tebhaga' means division in three parts. The objective of the movement among the peasant class was that a cultivating peasant must get two-third share of the total yield divided into three and rest one third would go to the owner of the land. The necessary political leadership to the movement came from the Bangla Peasant Association, a front

organization of the peasants and landless agriculture laborer of CPI. The movement took serious turn and reached its peak in 1946. It became very popular in north Bangla particularly in the districts of Jalpaiguri, Dinajpur, Maldah, Rajshahi, Rangpur, Bogra and adjacent part of Pabna.

In order to understand tebhaga movement we have to understand the land distribution system in that area. At the top of the land owning system was the class of zeminders who got lease of lands through permanent settlement of the British law. These zemindars have no direct link with the cultivation of lands owned by them. The link between the zemindars and the British government was that zemindars would pay a yearly tax fixed by the government depending on quantity and quality of the lands owned by the zemindars. How these lands would be cultivated, developed and what income would be generated was left to the zemindars. At the next bottom of etalon was the class jotdars to whom the zemindars distributed lands through a system called 'Pattani'. The pattani was achieved through negotiation on the basis of fixed taxes to be renewed and reviewed time to time. The jotdars class was the real people directly connected with lands and cultivation. Although outside the 'jotdari system' there were many land owning individuals; small and big who directly paid their land taxes to the zemindars through the 'Nayebi' 'Tahsildari' system of the zemindars, the jotdars in north Bangla used own vast lands to the tune of hundreds and thousands of acres and they were the real class of people whose fortune and fate were directly land linked. Therefore these people who had to look after cultivation and development of lands so far its yield were concerned.

Thus the fate of the farmers were linked intricately with jotdari system. Now, jotdars used two system of cultivation: a. employ agricultural laborers to cultivate lands under the direct supervision of the jotdar himself. b. give lease of lands to individual farmers, a small land owning class of people who directly cultivate lands of their own or taken lease from a jotdar for a particular period of time which depended on the sweet will

of the jotdar. The terms of conditions of such arrangement were: All investing cost of cultivation of leased land had to be borne by the farmer; the total yield of corps must be shared equally between the cultivator and the owner of the land i.e. jotdar. This system of cultivation of land was commonly known as 'Adhiary Pratha' (half-half system), mostly prevalent in north Bangla. This class of cultivating farmers was known as 'Adhiar' (half sharer). Through this mechanism, just because a jotdar owned a piece of land he used to derive benefit without investing any thing in the land. More over he used to exploit the labor of a cultivator in various forms- the poor man becoming almost a slave of the landowner. There was always a constant threat over his head that if he did not listen to the jotdar he would take away the land and he would have to starve. This was surely a system of exploitation to extreme limit.

Thus zemindari-jotdari system used to be a instrument of exploitation that had been agitating the people belonging to the peasant class. Their grievances grew as the economic situation in the country getting worse in the post war period that immediately followed a terrible famine (1942) throughout Bangla, at that time being governed by Muslim league with Shaheed Surwardy as chief minister. The economic situation, political unrest, and unbearable social conditions of the peasants led to the movement later known as Tebhaga Andolan. The communist leaders and Krishak samity leaders took full advantage of the unrest prevailing among the poor peasants and land less agricultural laborers.

The movement sparked off in an area under PS (admin unit in British system) Chirirbandar in the district of Dinajpur. The area had a local communist leader, Shri Rupnarayan Roy, himself a small land-owning farmer and local organizer of Krishak Samity, first and only MLA (member of the legislative assembly) of Bangla assembly elected from CPI ticket in 1946 election. He, together with other peasant leaders of the locality led a movement in and around his locality and organized the peasants mostly Hindus belonging to Kshatriya caste and some Muslim cultivators in a grand assembly on the day when jotdars men would come to collect 50% share of the corps. The assembled

farmers refused to give 50% , instead they offered 33 % out of total yield. A serious fight flared up between the jotdars' armed men and the adamant peasants resulting in several injuries to both parties.

Police came to the rescue of the jotards' men and in doing so a peasant was killed in police fire. The event took serious turn; local villagers came on the side of the peasants and police had to retreat. But couple of days later reinforced police force set a reign of terrors in village after village in Chirirbandar police station- the leaders were haunted out, even common villagers including women were not spared from their physical torture and repressive action. Common methodology used by the police for physical torture were divestiture of clothes of womenfolk followed by beating with lathes (batons) and for men putting the man in between two hard bamboos and the sliding those bamboos over the body from feet to head apart from kicking with boots and charging with lathes (baton) and iron rods.

Hundreds of villagers were arrested.

This was the ignition that sparked the tebhaga movement and spread throughout north Bangla and in some parts of southwest Bangla including Jessore, Khulna and 24 Parganas within a year. I myself saw, as a boy of class six in those days, hundreds and thousands of peasants, men and women from different villages were being arrested and brought to the Kotwali Police station in Dinajpur district town, not far from our residence. They were harassed, tortured and physically beaten. My father got involved in the movement, not as communist or peasant leader, but as a lawyer and as a humanist. He tried his best with others to defend the cases of tebhaga accused poor people and used to move numbers of bail petitions every day. I saw him how he spent his hectic days at that time.

The political change because of partition of Bangla in 1947 brought the end of Tebhaga Andolan, at least its intensity waned in the northern districts of the then East Pakistan. The new Muslim League government suppressed the movement with stern hand. The veteran communist leaders mostly being Hindus and the activists of the movement, were termed as enemies of the so

called Islamic state of Pakistan, and as such were put either behind the bar or repulsed out of the country.

What happened at Nachol

In 1946 Ila Mitra was just a housewife in a conservative Hindu zemindar family at Ramchandrapur. But slowly, together with her husband, she was taking part in the peasant movement of the locality. Ramen Mitra wanted her wife to take part in communist movement as she did in the past as a student in Kolkata. Encouraged by her husband Ila Mitra gradually came out of the family boundary. When riot broke out in Kolkata, Bihar and some parts of East Bangla, Ila Mitra came down to Noakhali under the directives of CPI, extensively toured the affected areas together with Mahatma Gandhi and other Hindu-Muslim leaders and took part in rehabilitation work among the distressed people. This was the first time, being a housewife of a conservative Hindu family, she came out of the forbidden boundary of the family and came directly in contact with the common mass.

Then came the partition of Bangla in 1947 and Zemindari of Mitra family of Maldah fell within the territory of East Bangla, then a province of Pakistan. The family, particularly at the insistence of mother in law of Ila Mitra decided to stay back in Pakistan. The geographical area of the Zemindari was included in the district of greater Rajshahi. The partition created an unsteady state in the minds of the local people mostly inhabited by Hindus and so called Adibasis (aboriginals), the Saontal community. The decision of Zemindar family to stay back created a sense of relief to the non-Muslim population.

On the day of 14th August, 1947 in an assembly of villagers in Ramchandrapur, Ramen Mitra, the CPI local leader hoisted the Pakistani flag.

The event acted as a reassuring antidote in the mind of the minority community. At the initiative of local peasant leader Altaf Hosain a school was established at the village Krishna-Gobindapur, about five minutes walk from the residence of Zemindar family. The villagers demanded that to educate their sons and daughters, the Badhumata i.e. Ila Mitra must become a teacher of the school to which Ila Mitra agreed.

The school started with 3 students, which rose to 55 within a year. She took it as a challenge and dedicated her life in removing illiteracy from the village- she gradually, centering the school, initiated a movement of 'education for all'. This gave her a unique opportunity to interact with peasants and their problems, their aspirations and needs. She became their 'Rani Ma' (Queen Mother). Krishna Govindapur is a non-Muslim dominated area of which Adibashis form an important component in the local population. The Adibashis belonged to cultivating class having no land of their own, most of them were adhiars. Apart from the Adibashis, other Hindu cultivators were from Kshatriya, Bhuindas and Kaibartas castes.

After partition of Bangla in 1947, five police stations of Maldah district came under Rajshahi district in Pakistan. Those five police stations were Nababganj, Bholahat, Shibganj, Nachol and Gomostapur. The Saontals of these areas had the great tradition of fighting against the British imperialism for their independent homeland under the leadership of Jitu Sardar. The Nachol Bidroha (Nachol rebellion) of 1950 against the Pakistanis was the legacy of that tradition.

Due to stern and repressive stance against the communist party by the Pakistani rulers, the party decided to work from under ground. All the leaders, including Ila Mitra, were asked to go underground. This was in 1948- Ila Mitra was then carrying. She silently crossed over to Kolkata where she gave birth to her son Mohan. The child was left under the care of her mother-in-law at Ramchandrapur.

Ila returned to peasant movement after 3/4 weeks. Under cover, she returned to Nachol to give leadership to peasant movement with her husband.

But where is Nachol? As I said Nachol is a police station now in Nawabganj district. It is an inaccessible area even for today. It is about 35 km from Rajshahi town. It is better to approach Nachol from Rajshahi via Tanore (about 15 km north from Rajshahi) crossing the border between Rajshahi and Nawabganj about 10 km from Tanore directly westward. The local peasant leaders with the help of the underground communist and Kishan Samity

leaders worked relentlessly preparing the ground of tebhaga movement in those locality for two years from 1948-1950. In popularizing the movement among the peasants, apart from Ila Mitra and Ramen Mitra, the organizing leadership on the surface were provided by the local leaders. Those included among others were: Sibu Koramudi, a Saontal communist leader from Rajshahi, Matla Majhi, Tutu Hembram, Chitor Majhi, Sagaram Majhi, Sukra Madang, Chutar Majhi, Sukhbilas Barman, Bhagirath Karmakar etc. It may be remembered that at this time when Tebhaga Andolan was getting momentum under the fiery leadership of Ila Mitra the movement in other districts of East Bangla had been crushed by the Muslim league government.

In the area of Nachol of which Chandipur, Krishnapur, Kendua, Ghamura, Shibnagar, Manda, Golappara, Mallikpur, Kalupur, and Mahipur were the most sensitive area of the movement the jotdars used to get two-third share and one-third went to the cultivator instead of half-half as in other districts of north Bangla. For husking rice from paddy the laborers used to get 3 Aras (katha/dhama) only out of 20 Aras. Ila made her head quarter of the movement in the village of Chandipur at the house of veteran Saontal communist leader Matla Majhi. The objective of the movement was straightened out in very simple terms: two-third share will be for the cultivator and one-third will be for the jotdar, out of the total yield. For rice husking from paddy, out of 20 Aras of husked rice, the laborer would get seven Aras and the owner would get rest i.e. 13 Aras.

In local dialect the slogan was: ' Sat Ari jin o Fasaler tebhaga'

(for husking seven Ara and three share for cultivation). In order to make the demand popular Ila Mitra extensively toured village after village, met the Khet majors (agricultural laborers), common cultivators, small farmers and publicly addressed the peasant meetings in the remote corners of the villages giving bluff to the police administration. In this way she earned the title 'Rani Ma'. A song was composed by a village poet :

'Lila Maitri Nari,
Ain Karlo jari
Adhi Jami Tekuti Bhag

Jin holo Sat Arire Bhai

Jin holo Sat Ari'

Thus a ground was ripe for launching the final phase of the movement to get their demand materialized. The leaders also organized a defense force from among the revolutionary peasants in which Hindus, Muslims and Saontals took part, although the Saontal community dominated the force. The force was equipped with bow with arrow, spears, lathe and home made different types of choppers with haft etc... The force was trained how to repulse the attacking police force and to make defense formidable. The force was also taught how to retreat safely. Another popular slogan among the peasants was: 'Whoever possesses plough, land belongs to him' (Langal jar Jami tar).

As the movement gained momentum leaders thought that that time was ripe to give effect of the tebhaga doctrine. The implementation of the principle began with Mitra zemindar family of Ramchandrapur. It was not an easy task. By persuasion and negotiation by the leaders including Mitra couple the family accepted tebhaga doctrine of distribution of yield. This happened in autumn of 1949 at the time of major harvesting season. The zemindar family had over 500 bighas of crops yielding lands. Encouraged by the initial success the leaders imposed the principle on other zemindars and jotdars one by one sometimes through persuasion, some times using threat and sometimes using force. By 1950 almost all landowners in and around Nachol were forced to accept the 'Sat Ari and Tebhaga doctrine'.

The method, the peasant leaders adopted for implementing the doctrine was a very simple but effective one. After harvesting the crops of particular field the owner of the land was invited to be present on the day in presence of the leaders of the movement, common villagers and the cultivator. In his presence or absence of the land owner total crops of the field was divided in three parts- keeping two-third for the cultivator, rest one-third was sent to the owner carried by cow driven cart. The landowners were forced to accept the distribution.

But in the eye of the administration and the landowners this was looked upon as illegal and 'looting of yields' by force. In most

cases the process of implementation had been smooth except in one or two cases force had to be employed. One such case was the zemindars of Mahipur who refused to yield to the pressure of the leaders and used firearms to repulse the assembled peasants and leaders. But ultimately the zemindar had accepted the demand.

But the government could not sit idle particularly when the landowners, jotdars, and zemindars both collectively and individually appealed to the administration (Muslim league was essentially a party of the landed gentry of conservative Muslims) to end this 'terrorism' of the peasants. The zemindars and jotdars now with help of the police force started to take revenge. The police let loose reign of terror and oppression in the rural Bangla to suppress the movement. Many peasant activists and innocent people were tortured and taken to police custody. The police also started combing operation after surrounding a locality. The life of underground leaders gradually became unbearable and unsafe. The movement reached its peak. A showdown became evident.

Date line 5 January 1950

On 5 January 1950, a group of constables led by an officer in charge (OC) of Nachol PS arrived in village Chandipur, the nerve center of the movement. They arrested two activists and tortured them to get information of tebhaga movement and its key leaders. Some villagers, as per planed method of sending message of danger raised a red flag on top of a long bamboo and started beating tom-tom (madal), a kind of drum usually played by Saontal community. Hearing the message of danger thousands of villagers assembled at Chandipur equipped with native weapons described earlier. The small police force was captured by the angry villagers and 5 constables as well as the OC was killed in an ensuing fight as the police opened fire to disperse the armed mob. This incident caused great panic at Nachol police station in particular and the surrounding police stations in that area. The precarious position of the police was signaled to higher authority.

Two days after the incident, i.e. on 7 January 1950, nearly 2000 soldiers arrived at Amnura Railway station. The army

surrounded all villages of Nachol, set fire 12 on villages, ransacked houses after houses and gunned down many villagers as they tried to move towards Chandipur village. The army was supported by armed police and Ansars (a para-militia force organized after the model of the people of Medina, in Saudi Arabia, who helped and defended Mohammad when he took political asylum in Medina following a threat of persecution by the people of Mecca who opposed his new religion). They moved in door to door in search of the wanted leaders, as usual looted and set fire on the houses, tortured the male members of each and every family of the village, women were raped indiscriminately, even children were not shown any mercy.

An unequal fight started- on one side thousands of Saontals-Hindus and Muslim peasants comprising the defense force of tebhaga, and on the other, were army, riot police and Ansars armed with modern weapons. The peasants could not hold the ground for long- they had to give in. Hundreds of saontals were killed. Bow and arrow could not be a match against the sophisticated guns. Group by group they retreated and finally crossed over to India. Villagers were forced to leave the country to escape inhuman repression at the hands of law enforcing agencies.

The exodus of the villagers left the underground leaders of the movement exposed to the police. Comrade at arms Matla Majhi asked Ila Mitra to accompany his team for safe place, which she declined as Matla himself was not in a good condition to move. The peasant comrades suggested their Rani Ma that they would safely take her to other side of the border under cover of rice paddy in a cow-driven cart. But Ila Mitra did not agree until all her comrades at arms and volunteers of her defense force could move to relatively safer zones from Nachol.

Other tebhaga leaders of Nachol including Azahar Hosain, Animesh Lahiri and Chitta Chkraborty were arrested while trying to escape from the locality on 8 January 1950. In the process of escaping and taking shelter in safer places Mitra couple got separated from each other in two groups. The group led by Ramen Mitra could safely cross the border. The other

group with Ila Mitra and Brindaban Saha and hundreds of Saontal followers of the Rani Ma, dressed in Saontal dresses left the last village of Nachol Police station on 7 January towards Indian border westward. They took shelter near Rohanpur Railway station for rest. But unfortunately, even though she was dressed as Saontal woman and were found to speak in Saontali dialect, she was detected as non Saontal by the detective police moving around the assembled Saontal people. The police immediately arrested her with all her companions. Hundreds of them were brought to Nachol police station. At the police custody the police inflicted brutal torture on the captives.

The police unleashed inhuman torture on the peasants to make them confess that it was Ila Mitra who led the fight on that day and she ordered to kill five policemen and the OC. But none confessed- one comrade succumbed to death due to police torture. Several others met the same destiny soon. According to rough estimation the number of death by police torture lies between 70-100. Once all her comrades at arms and followers were dead under police torture they turned to Ila Mitra. They inflicted all types of physical torture at their disposal on her for 3-4 days at Nachol PS. Her faults were- she was woman, she was a Hindu, she was a communist and above all she led the tebhaga rebellion with arms. She was a dangerous element. She survived this inhuman police torture only because she was an athlete and used to tough life style. After 4 days of torture at Nachol she was brought to Nawabganj police station: unconscious, delirious and smeared with blood.

Given below are some examples of brutal torture inflicted on Ila Mitra the agents of so-called Islamic state-Pakistan. The types of torture are recorded in her statement given to the Rajshahi Court.

Physical torture

1 Non stop beating hanging her on a bar or hands and feet tied.
2 Pressing hands and legs in between two bamboo sticks.
3 Beating on heads with rifle butt.
4 Kicking delicate parts of the body with boots on.

5 Stripping of cloths followed by beating on naked body.
6 Starvation, even drinking water was denied.
7 Solitary confinement within a cell.
8 Piercing iron nails through heels.
9 Pushing foreign body (hot boiled egg) in her private parts.
10 Raping her in group.
11 Insulting remarks and abuse

On 10 January 1950 she was brought to Nawabganj in unconscious and delirious condition. At the Nawabganj police jail gate the sepoys received her with blows on her forehead. She however here received much better treatment compared to what happened at Nachol police custody. She got medical treatment and finally was transferred to Nawabganj public hospital on 12 January 50 as is evident from her jabanbandi (statement). The OC of Nawabganj PS, happened to know Ila Mitra at Kolkata. He treated her well and made sure that no such brutal oppression was repeated. Ila Mitra later on remembered his kind behavior with gratitude. She later on recalled: the OC of that police station Mr. Raham knew me. When I was studying at Bethune he was a student of Scottish Church College. My fever at that ran very high. Blood was streaming out from my whole body. Under such condition I was left alone in a cell. OC Mr Rahman used come at night unnoticed and used to pour water on my head and freshened me up; he also feed me with fruits. I shall never forget his greatness. I was there at Nawabganj for 7 days. Every night throughout seven days he nursed me with care and love and gave medicine. Otherwise I would have died there.

Many came inside the cell to beat me up, but he sternly resisted all saying that she was under trial and no one should raise any hand on her. The attending doctor Mr. Ayub Ali was also very sympathetic to her. Even then on 16 January she was forcibly taken to a house to sign a blank paper under threat and physical torture.

Communal tension: hunger strike of the security prisoners

As the condition of comrade Mitra continued to deteriorate she was brought to Rajshahi Central jail in a very poor state of health

on 21 January 50 and was directly admitted to Rajshahi Central Jail Hospital. The matter did not end there the attempt was being made at the instigation of Muslim League government to color the Nachol rebellion as Hindu-Muslim conflict in which the Hindus and Saontals deliberately killed the Muslims including the ASI of Nachol police station. The widow of the deceased was brought to Rajshahi jail gate by the interested quarters that wanted to make it a political issue in favor of the vested interest of the ruling Muslim league government. She tried to agitate the common prisoners and sepoys by saying that her husband was killed by the Hindus and Saontals. So they must take revenge against the Hindu prisoners particularly those who were accused of Nachol episode. The jailor Mannan played a significant role in this matter. Often he used to bring Ila Mitra from the jail hospital to the jail gate, in semi naked condition, showing her to the sexually starving prisoners: "Look at your Rani Ma. She even became a queen". This created a tense communal situation inside Rajshahi jail among the prisoners. For this reason the Hindu security prisoners dared not to come out of their wards during those days. Seeing no alternatives the security prisoners submitted a memorandum to the chief minister Nurul Amin giving him a 15 days ultimatum to ease communal tension in side the jail- otherwise they would go for hunger strike to redress the situation. As nothing was heard from the chief minister the security prisoners resorted to hunger strike from 2 February 1950.

On the ninth day (10th February) the district magistrate came to see the conditions of hunger strikers and assured them that the administration was taking appropriate steps to ease the tension and bring back normalcy. Since then the wife of the deceased ASI stopped coming at the jail gate and jailor Manna was cautioned for his communal utterances.

Notorious Jail Killing at Khapra Ward, Rajshahi Jail

After some time Ila Mitra was brought to Rajshahi central jail from the hospital in a slightly better condition. She was put in a small cell in a sick condition. The security prisoners already came to know about her and Nachol rebellion. Ila Mitra also came to know the conditions of the security and common

prisoners. The general prisoners were demanding better conditions inside the prison. Their demand for improved diet was supported by the security prisoners, who began a hunger strike on 5 April 1950 in support of the common prisoners' demands. This ultimately led to the notorious jail killing in Khapra Ward on 24th April. The sepoys opened fire when the jail superintendent Mr Bill accompanied by the jailor and two deputy jailors came to visit the jail. On that day seven security prisoners, Hanif Shaikh, Sukhen Bahattacharya, Delwar, Sudhin Dhar, Bijan Sen, Kamparam Singha, and Anwar Hosain died on the spot. There were 31 security prisoners in the jail out of which seven met death and many others received serious injuries including Mansur Habib, Nurunnabi Choudhury, Abdul Haque, Amulya Lahiri, Babar Ali and Abdus Shahid.

Nachol Case opened at Rajshahi Court

In November 1950 the case of killing ASI of Nachol was formally opened at the court of first class magistrate Mr. Ahmad Mian. There were 31 accused of which most prominent of course was comrade Ila Mitra. Others were: Animesh Lahiri, Azahar Shaikh, Brindaban Saha, Sukra Kamar, Renga Bali, Sukh Bilas Singha, Chatur Majhi, Jadu Majhi, Chhanu Majhi, Bhadu Mandal alias Bhadu Barman, Dulu Majhi, Upen Koch, Mangla Mandal, Indria Morsu, Suren Barman, Toton Majhi, Lalo Ray, Skifem Majhi, Gopal Singha, Mohanta Mallik, Syfal Majhi, Deben Ray, Smay Jaren, Kishan Tadu, Chinu Ray, Khoka Ray, Nagen Sardar, Durga Bakshi. Later on out 31 last eight were dropped making the list of 23 accused. Comrade Mitra recalled the event: After medical treatment for more than a year as I recovered slightly- I was attacked with Malaria and Kalajar (Typhoid). At that time if I were not properly taken care of by Manoroma Masima and Lily I would have not survived. When I resumed the strength the trial began. As I still could not walk properly I had to go to the court in horse driven cart with police protection. The very day I returned from the court I forcibly entered the female ward where the general female prisoners and security prisoners lived. Since then I did not return to the solitary cell. Other security prisoners also helped me in this respect, otherwise I could not have stayed there. I found many security

prisoners in the ward among whom I still remember Manoroma Bosu, Pultul Dasgupta, Sujata Dasgupta, all of them from Barisal, Bhanu Debi of Khulna, Lili Chakraborty of Pabna, Amita Datta, Susama Debi, Aparna Roy Choudhury of Sylhet, Bhdra Mani Hajang and Arsa Manigupta of Mymensingh and Rekha of Naogaon, in total 14. They all tried to help me survive and keep my strength to face the trial.

Although the case was initiated in November 1950, the hearing started in January 1951. A noted lawyer of Rajshahi bar Mr Biren Sarkar and others defended her case. Manoroma Masima insisted that she must give a vivid statement of what happened at Nachol police station. Bhanu Devi cautioned her if she did not disclose the full truth of torture on her body including sexual violence she would recommend to the party leadership for discontinuing 'Ila's membership. All her co-prisoners including the common prisoners encouraged her to tell the truth. Inspired by their advice she decided to give a factual statement of the police torture even at the expense of her personal and family honor. She admitted later that although she was a communist but still then as a Hindu girl she was in a dilemma and was confused. She faced immense difficulty to overcome the social barrier. Finally she spoke out the whole truth of the event.

Reproduced below is the statement of Ila Mitra given before the court of Rajshahi January 1951:

I know nothing about the case. On 7 January 1950 last I was arrested in Rohanpur and taken to Nachole the next day. The police guards assaulted me on the way and thereafter I was taken inside a cell. The SI (Sub Inspector) threatened to make me naked if I did not confess everything about the murder. As I had nothing to say, all my clothes were taken away and I was imprisoned inside the cell in stark naked condition. No food was given to me, not even a drop of water. The same day in the evening the sepoys began to beat me on the head with butt ends of their guns, in the presence of SI. I was profusely bleeding through nose. Afterwards my clothes were returned to me, and about 12 midnight I was taken out of the cell and was led possibly to the quarters of the SI, but I was not certain.

In that room where I was taken they tried brutal methods to bring out confession. My legs were pressed between bamboo sticks, and the people around me were saying, I was being administered a Pakistani injection. When this torture was going on they tied my mouth with a napkin. They also pulled off my hairs. But as they could not force me to say anything, I was taken back to the cell carried by the sepoys because I could not walk due to the brutal torture they inflicted on me that night. Inside the cell again the SI ordered the sepoys to bring four hot eggs, and said, now she will talk. Thereafter four or five sepoys forced me to lie down on my back, and one pushed a hot egg through my private parts. I was feeling like being burnt with fire, and became unconscious. When I came back to my senses in the morning of 9 January 1950, the SI and some sepoys came into my cell and began to kick me on my lower abdomen with boots on. Thereafter a nail was pierced through my right heel. I was then lying half conscious, and heard the SI muttering: We are coming again at night, and if you do not confess, one by one the sepoys will ravish you. At dead of night, the SI and his sepoys came back and the threat was repeated. But as I still refused to say anything, three or four men got hold of me, and a sepoy sexually began to rape me. Shortly afterwards I became unconscious.

Next day on 10-1-50 when I became conscious again, I found that I was profusely bleeding and my cloth was drenched in blood. I was in that state taken to Nawabganj from Nachol. The sepoys in Nawabganj jail gate received me with smart blows. I was then in a prostate condition and the Court Inspector and some sepoys carried me to a cell. I had high fever then and I was still bleeding. A doctor, possibly from the Govt. Hospital at Nawabganj had noted the temperature of my body to be 105F. hen he heard from me of profuse bleeding I had he assured me that I'd be treated with the help of a female nurse. I was given some medicine and two pieces of rugs.

On 11 January 50 the female nurse of the Govt. Hospital examined me. I do not know what report she gave about my condition. After she came, the blood stained piece of cloth I was wearing was changed for a clean one. During all this time I was

in a cell of the Nawabganj PS under the treatment of a doctor. I had high fever and profuse bleeding and was unconscious from time to time.

On 11 January 1950, a stretcher was brought before my cell in the evening and I was told that I would have to go elsewhere for examination, on my protest that I was too ill to move about, I was struck with a stick and forced to get on the stretcher after which I was carried on it to another house. I told nothing there, but the sepoys forced me to sign a blank paper. I was at that time in a semi-conscious state with high fever. I was, on the following day, transferred to the Nawabganj Govt. hospital, and on 21 January 1950 when the state of my health was still very precarious, I was brought from Nawabganj to Rajshahi Central jail, and was admitted to the jail hospital. I had not under any circumstances said anything to the police, and I have nothing to say than I have stated above.

NB: The statement was issued in Banglai. As it was not published in any dailies, it was translated into English and was circulated throughout East Bangla as an Istahar (Pamphlet) during early 1950. The worst parts of torture were of sexual violence. It had two kinds: (i) forcibly pushing a hot egg inside her genitalia and (ii) violent raping by a sepoy. Both of these offensive actions were imparted at the instruction and presence of S.I. of Nachol.

What happened to Ila Mitra's Co-fighters and other comrades?

After the arrest of the Queen Mother of the rebellion, the police force became all the more ferocious. The Saontals and poor peasant villages became their target of atrocities. Hundreds of Saontals, after arrest, were brought to Nachol police station. They were put in a single cell without food and drinking water. Some were left outside on open field with their hands and legs tied up. More over non-stop beating with batons and rifle butts and kicking with boots by the sepoys continued. At least 24 Saontals were succumbed to death due to physical torture and starvation. Even after such brutality, they were brought to Nawabganj police station headed by an OC of relatively kind hearted man. The brutal torture on the Nachol peasants continued at the Nawabganj Police Station and many died in the police

custody. A few days later the entire arrested group of the arrested Saontals of Nachol were transferred to Rajshahi Central jail wherein they were confined in a small room. They were constantly physically tortured, kept half fed and even some were killed.

These brave soldiers of the Nachol movement were not only tortured by the police, but they were also harassed by and met with unkind behavior from the common people, ignorant of facts of Nachol episode. They believed in the propaganda and fabricated false stories made by Muslim League government and Muslim League volunteers: these people are Hindus, anti Pakistani, members of Hindustani army and agents of the enemy country (India). Influenced by this kind of propaganda the common workers of jail did not supply drinking water even to the dying accused. Such was the communal tension prevailed at that time inside Rajshahi Central jail.

Most of the under ground leaders of Communist Party and Kishan Samity could escape to India including Ramen Mitra (alias Habol Mitra). But many were arrested while trying to escape, notable among them were Azahar Hosain, Animesh Lahiri- both were then at the residence of Azahar, and Chitta Chakraborty while he was addressing an assembly of Saontals in the Badarpur village on 8 January 1950. Most of them later were brought to Rajshahi central jail.

Nachol Event not Discussed in East Bangla Legislative Council

The story of Nachol rebellion never appeared in any newspapers either in East Bangla or in Pakistan Observer. A few opposition leaders (three of them) belonging to Pakistan Congress Probhash Chandra Lahiri, Manoranjan Dhar, Gobindalal Banerjee, Bhabesh Nandi (?), Manohar Dhali, and BK Das gave a notice to the speaker to move certain adjourn motions in connection of police excess following killing of police officer at Nachol. When the assembly met on 6 January 1950, Mr. Prabhash Lahiri enquired about the fate of their notice. The speaker at the advice of the chief minister Nurul Amin disallowed the adjourn motions to move in the assembly. The argument of the CM was that since the matter of killing of a few constable and an ASI was under

trial, it could not be discussed in the assembly to which Mr. Lahiri replied that they were not willing to discuss the killing event but would like to discuss the matters that happened afterwards when the police and military let loose the reign of terror on the innocent villagers. Mr. BK Das, leader of the opposition, contended in reply to CM's objection: ' The Nachol excess by police is a public matter and as such it must be discussed in the assembly in the interest of the public. After the killing of the police officer, the police, army, EPR and Ansars went to the place of occurrence with the intention of restoring law and order. But our contention is that in the name of restoring peace and order they have been committing inhuman repression on the general peace loving mass. The opposition wants to discuss the matter relating to atrocious police action as a separate issue treating the event of police killing totally isolated.

Mr. Manoranjan Dhar, another prominent opposition member pointed out, ' even the killing of police men could be discussed because as yet no case has been filed in any court in Pakistan-mere police investigation is being conducted. Police investigation and pending case of trial in a court are two different things. Let the government put proper documentary evidence from the court that such case is under trial.

But the speaker remained unmoved to please the CM and gave a ruling in favor of the CM's desire. What happened to the case against Ila Mitra and her co-accused?

Ila Mitra was the chief accused. She was charged with directly murdering sepoys and an ASI. The charge sheet reported that she was the main leader of agitating the peasants against the landowners, jotdars and zemindars, organizing the so-called Tebhaga Movement, looting forcibly yields etc. She also led the unlawful assembly of peasants in Chandipur village on 5 January 1950. The accused were charged with the offence committed under sections 148, 302/149 of Pakistan Penal code.

The trial continued for three months in the magistrate court of Rajshahi. The then district session judge S Ahmed gave the verdict of the case on 11 January 1951 pronouncing life imprisonment to all the accused including their leader Ila Mitra under the section 302/149 of Pakistan penal code. The learned

judge observed in his verdict: "Although all the accused took part in the unlawful assembly and some of them were party to killing, yet as it could not be definitely ascertained who were they, and as it could not be ascertained at whose strike or strikes the victims succumbed to death, the court therefore refrained from pronouncing capital punishment."

Appeal to High Court

An appeal was moved to Dacca High Court. The famous advocate of Comilla Bar Mr. Kamini Kumar Datta appeared for her with active cooperation from a famous lawyer of Kolkata Mr. Yusuf Jalal and others. Ila Mitra was then at Rajshahi central jail, almost verging on mental break down apart from physically disabled to move freely. She described her condition of those days in this way:

"Some time the happy moments of giving birth of my son and the following sixteen days flashed, but immediately faded out. ..... I didn't know where was my husband, who was then still hiding with a warrant of arrest ... couldn't remember any sweet memory of my past life... all seem to be lost in the darkness. .... Some time I could hear the voice of the judge, but again everything goes to nothingness. "

Simultaneously a writ petition was moved at the Dacca High court bench for retrial of the murder case of ASI and sepoys at Nachol on the ground that fair trial was denied at the magisterial court of Rajshahi. The high court bench, constituted of Justice Elis and Justice Isphani, in its judgment (22. 04. 52) asked the government not to implement the verdict of the lower court and ordered for retrial of the case. This was a great moral victory on the part of the people of Nachol who whole-heartedly supported the cause of the movement and their leaders. As government couldn't bring any more new evidences for retrial the high court reduced the tenure of imprisonment to 10 years. This is a partial relief to the accused. But to ILa Mitra it meant nothing as she was in a terrible state of health physically as well as mentally.

Ila Mitra brought to Dhaka Central Jail

As her condition at Rajshahi jail deteriorated, she was brought to Dhaka Central Jail and subsequently moved to Dhaka Medical

College almost in a dying condition with broken health and total physical disability. She was placed under a small medical board headed by Dr SK Alam for thorough investigation and treatment. This was in 1953.This was the time when East Bangla was bubbling with movement for democracy, students have made supreme sacrifice for language in 1952 and people were fighting against the repression of Nurul Amin Government of Muslim League. In the minds of the people the language martyrs, Shahids of Khapra ward of Rajshahi jail, Ila Mitra and the co-sufferers were the heroes of the day. Demands were raised for the release of the security prisoners and Ila Mitra. Treatment at DMC did not improve her condition significantly, although she regained her walking ability very slowly.

Her condition became a great concern of conscious people. On 5 April 1954, five members of the East Bangla Legislative Assembly issued a statement expressing their concern in which they stated : On 3rd and 4th April we saw Mrs. Ila Mitra in Dacca Medical College. Being constantly in jails and police custodies she had been suffering from incurable decease that had brought her to dying state. At present she was totally disabled to walk and completely bed ridden. She could not take any thing. Adopting an alternative way of feeding is prolonging her life. Her 5-year-old son is now with a relative of hers. If she were not released without any condition, it would be difficult to save her life. "

Moulana Bhasani and some other leaders also issued similar statements. When Ila Mitra was brought to DMC hospital every day hundreds of students, elites, and political leaders of all shades used to visit her. Looking at her wretched condition it was difficult for any one to resist tears. To what extent a state machinery could be cruel - case of comrade Ila Mitra is a glaring example.

Ila Mitra, daughter of Kolkata, 'Rani Ma of Banglar Krishak' returned to Kolkata.

Some time in mid June, 1954 Ila Mitra was released in a parole and was allowed to go to Kolkata for medical treatment. Dr. Alam of DMC with whom Ila Mitra developed a friendly relation

himself accompanied her to Kolkata and he was with her till she got admitted at Calcutta Medical College Hospital. Ila Mitra did remember this noble hearted doctor throughout her life in different ways. She was taken to Kolkata by plane- she recalled the day this way: ' The day I departed from East Bangla by plane is still in my memory. The gentle me who sat beside me was not only a Pakistani citizen but also a highly educated well placed officer. Drawing my attention to the scenic beauty of watery, flat riverine East Bangla, he repeatedly asked me if I, being a foreigner, would forget my love to the soil of this country. He requested me with utmost sincerity to return, saying that Pakistan needs daughter like me. I don't remember what was my reply. ' The Government of Pakistan did not like the very sympathetic attitude of Dr. Alam shown to Ila Mitra for which he had to suffer in his professional life.

Life in Kolkata

She was at Calcutta Medical College Hospital for about 8 months under the treatment of Dr. Shishir Mukherjee. The family was reunited - she saw her son after 1948. In the mean time while her mother-in-law died. Ramen Mitra, her husband, was her source of inspiration at this critical hour of her life. Apart from party leaders, the elites of Kolkata visited her almost every day at the hospital. The condition of Ila Mitra at Calcutta Medical hospital has been described by novelist Dipendra Bandopadhyay in a touchy language in the following manner: During those painful days "the bed sheet is lying on the floor. There is a pain in the bunch of hair in her head. The agony is very much evident in her eyes. There is an unbearable pain in her small girlish body. Agony in her intensive and sharp cry. Unbearable pain in her sufferings- and agony in her twisted body trying to bear the terrible torment are quite evident."

During those painful days many provided inspiration. Suchitra Mitra solaced her by singing Tagore's song at her bedside- Subhash Mukhopadhyay inspired her to fight out her agony by reading from Sukanta. He composed a poem on her ' Keno Bon Parul Dako Re'. In some portion of the poem it reads:

"Shiyare jege satti bhai

Mrityuke aaj taray
Futibe Phul Laksha Ashar
Jeeban hat baray
Shikale ba(n)dhe spardha kar ?
Parul bon aamar "

Within 4-5 years Ila Mitra came back to life - joined the party activities slowly, passed MA in Bangla in 1957 as a private candidate. She joined Calcutta City College (south) as a professor of Bangla. This she had to take up for a living, as her husband was a full timer in CPI politics. She gradually involved in West Bangla politics getting elected as member of West Bangla Assembly four times from 1967-78.

Bangladesh and Ila Mitra

When it became known to Pakistan Government that Ila Mitra had recovered from illness, the central government repeatedly asked the Indian government to send her back to Pakistan as she was still a convict of murder case. But her well-wishers resisted the move, never to Pakistan again under the then political structure. Since there was a significant change in political atmosphere in East Pakistan, non Muslim league provincial government(s) did not take any notice of the central government's desire.

Although Comrade Mitra could not return to East Pakistan, she throughout her life, never forgot the people of East Bangla, her second homeland- she constantly monitored political and social development in East Bangla. She had developed deep love and sympathy for the common people of Bangladesh and all along cherished a desire that a day would come when she would be able to visit this land. But for this day she had to wait till Bangladesh emerged as a free independent country through bloody war of liberation in which she and her party in West Bangla had significant contribution.

During Our liberation war in 1971 her house and party office was an open shelter for many of us. She was a friend- a co-fighter. She acted like a true daughter of Bangladesh - it was her war also for liberating the occupied land and its people. She

remembered those days in this way: " To fight as co-fighter with the people of Bangladesh for attaining their friendship it became my foremost duty; to me it was an opportunity to repay my debts to the people of Bangladesh from I received so much- my life, my own liberation. Those people had released me from the periphery of in law's house and from the prison of Pakistani jail- how could I forget them in their distress. Can I lag behind in their freedom of war ?"

We remember comrade Ila Mitra as a legendary personality of Bangladesh. She made sacrifice for the oppressed peasants and common mass. Her role even before her death in sharing the struggle of people of Bangladesh would be remembered by us for many years and she would be our constant and infinite source of inspiration in our struggle for democracy, secularism and equality of man.

Comrade Mitra not only remembered bad and turbulent days in East Pakistan, she also remembered some sweet memories too- its people who raised their voice for her release, many well wishers who tried to bring solace to her distress in those days at the risk of their own safety. We spoke of Dr Alam to whom she had immense gratitude. She had not forgotten the care, nursing, and love she received from Mr. Rahman, OC of Nawabgang police station. When after a few days in Nawabganj she was brought to house from the Thana cell, she was asked to sign a paper of confession. Even at the semi unconscious state she refused. She remembered that Mr. Rahman at one stage whispered to her 'you must not sign'. This brought back her courage and could tolerate the repressive measure applied to get the signature. She later on narrated the event in this way: " being encircled within this persuasive and oppressive police officers and sepoys only one man and his one sentence saved me that day. He whispered to me this order ' one must not put signature on papers like these. ' This grave words, as if appeared as revealed message' I needed most on that moment-elaborate explanation was necessary. By the side of death if those messengers of life and civilization were not present I would have extinguished for sure. "

Ila Mitra remembered help of another unknown gentleman. Let us hear from her own language: " Another event that I have not witnessed my self, but heard later on. A famous lawyer of Kolkata made some papers to fight the appeal case of ours at Dacca High Court. One of our well-wishers was carrying these documents to Dhaka by rail. During search at the border documents were discovered. The police officer seized the documents and left the railway compartment. While my friend was waiting for arrest, just before the train started moving the papers were thrown to his lap through a window and the officer immediately vanished. ... He is still unknown to me."

Ila Mitra Visits Bangladesh

She had never forgotten Bangladesh. Immediately after independence in 1972 and then again in 1974 to attend a conference of Bangladesh Teachers' Association. On the last occasion, during a courtesy meeting with the Bangabandhu he told her that Bangladesh considers Mitra couple as its son and daughter. He further told her that he would bring them back as citizens of Bangladesh. However, before his plan could be materialized Bangabandhu himself was assassinated by anti Bangladesh force within a year. We turned one eighty degree in our nation aspiration. In ret rogation we started from that moment from liberalism to fundamentalism, from secularism to Islamization, from democracy to autocracy and military dictatorship.

Ila Mitra and People of Bangladesh

Comrade Ila Mitra, although never returned to Bangladesh permanently, we consider her as our own daughter as Dr. S K Alam said once to her 'East Bangla needs daughter like you' 'Won't you ever come back?' This appeal of Dr. Alam, her life long friend, was since then remained a symbol of love of the people of East Bangla in her heart and mind. When she visited Bangladesh in 1972 and again in 1974- on both occasion she spent wonderful day with him and his family members.

She never forgot the people of East Bangla who, she remembered with extreme gratitude, their love to her and movement they built up for her release, and their fight for

secularism, democracy, autonomy and finally independence. She considered till her death East Bangla as her sacred land, holy place (thirtha bhumi). Although she could not participate physically in our movements for our identity and emancipation she mentally involved herself with our struggle as her own. That she could not participate in it physically caused much pain in her. She wrote at least 3 articles on East Bangla expressing her sentiments before and after our independence. In those articles her love and affection for our people have been beautifully pictured.

In one of her article, Purba Bangla Ajo Amar Thirtha Bhumi she wrote: .... Almost all knew that I was tortured in Pakistani state. Even today if that repressive demon force did not exist with its overwhelming power how could the relation between East and West be so venomous? What was then a torture on an individual now spread everywhere likes a bush -fire. At that time we were in peasant movement and were treated as accused of murdering of policemen. We knew that no state power when it caught its class-foes would treat them as daughters. But the unjust and inhuman state cruelty, we witnessed, had its root elsewhere. In the blind unjust consideration of Pakistani state policy we the non-Muslims are not worth becoming trusted citizens of Pakistan. This erratic Pakistani view provoked to commit social sin. That the Hindus and Muslims live in social harmony, both have equal status in the eye of law and state if are not appreciated and recognized then in this state, the capital of netherworld, terrible hatred among different people are bound to germinate from which we all have no escape. The same process of procreation of hatred is in the root of unrest and time-to-time volcanic eruption we find in the subcontinent. If this sin were not uprooted totally there would be no peace anywhere. But even then, when the people of that same Pakistan, not only those who are oppressed by the state, but those are in the administration, attracts my mind with love and affection; is that just an infatuation (moha)? I have a mixture of variegated experience in my blood. This is true that I was beaten with rifle-butts that caused wound in my respiratory pipe from where blood was oozing out. How could I forget the bloodshed of dishonor of my womanhood, and why should I? But this is also true that bloodless pale body of Mine gradually return to life- where did I

get it, what elixir was administered ? On side-by-side of the inhuman treatment, I received from the powerful state machinery, there were many souls who surrounded me with their love and nursing- their stories are also equally true. Day after day blood had to be transfused to my veins from out side. How could I forget that was collected from my Muslim brothers? I don't know if blood have any caste, - if there is any then I am an outcaste. ...

Such civilized days have not yet come in Pakistan that if I disclose their names they would be safe there. I found many sympathizers among the officials in Pakistan without whom there was none who could save me. I remember very much a day and a man. After the arrest, when I was devoid of consciousness, lack in perception, and almost dumb because of brutal torture. ... At that moment, surrounded by police, only one man and only a word from him saved me. ...; Today I am telling about some selected top officials, if I omit the consciousness and rebellious spirit among the mass then the behavior of those kind hearted officials to me would not be clear.

The movement that was created for our release is incomparable. As a result before I was really set free I could freely mix with the people; spectacular thing in my life. I was then at Dacca Medical Hospital under severe police security. Even then when hundreds of people, even from villages started pouring in them my guards themselves were drowned in stream of people and I just got lost in the ocean. In one such day I was astonished to see my husband on my bedside, who was then hiding to evade police arrest, as he was the number-one accused of our case. But police could not identify him.

The students who brought him were more alert than the police- they all the time kept him surrounded among themselves. The safely took him back. One interesting thing about our case the Nurul Amin Government could not produce a single Muslim witness against us. I asked myself many a times who are these people, being deeply religious themselves, opposing madness of the religious state? Are they enemies of Pakistan? Are they foreign agents? But my answer is- no, they have endless love for

Pakistan. And for this very reason they are fighting with their back at the wall against the danger of Pakistani Government's attempts to eliminate humanism and democracy from the soil of Pakistan.

To me Pakistan is even today a land of pilgrimage (thirthabhumi). A place of pilgrimage- because I knew very well that aspect of the characters of those people of the land who know how to fight in the midst of diplomacy of animosity and danger of politics between men and men. To have faith in men- this great force I acquired in Pakistan. Those who taught me this doctrine are my teachers. The two-nation theory based on religion has done greatest damage to Pakistan. This subcontinent of ours has evolved, nourished and developed as a land of pilgrimage of great men. Before the English took over, Muslim Emperors reigned in here for a long long time. In those days seeds of nation sates were germinated. Without great contribution of Muslim Emperors concept of oneness in India would not had crystallized.

History is very cruel. What I aspire for could not be achieved out of nothing. Relentless fight is another name of life. Without resisting process of decay, immortality could not be established. When I remember those people of East Bangla, known as well as unknown then I knew those who tried to discover a daughter in me as I fought from within Pakistan, even though I was a Hindu are themselves now in endless fighting as much bigger heroes. They are Pakistani nationals. But they have no alternative but fight as they themselves have seen the venom of two-nation theory based on religion. This struggle in first phase was against their own heart.

Since they recognized that freedom, liberty and unity of all human beings lie in democratization of the sate and in the hollow and false sound of theocratic state, they are tuning their religion with a new string. When I received such news of processions of East Bangla, I feel glorified, as I had spent a few most memorable years of my life in association with these heroes.

NB: The article of Ila Mitra Purba Bangla Ajoo Amar Thithabhumi was published in Sharadiya Kalantar in 1965.

In another of her writings on East Bangla titled Amar Jana Purba Bangla (The East Bangla as I knew) she once again expressed her gratitude to the common people of East Bangla, then a province of Pakistan who taught him how to fight against tyranny, oppression and for one's own right. These common peasants made her what she became in later period. She began her article in the following way: How the poor and common peasants of East Bangla wanted to mould newly created Pakistan I am a witness to it. In fact I fell in warm furnace of these blacksmiths who wanted to make Pakistan according to their vision like a blacksmith does by beating hot iron flakes to give his desired shape. Then I saw those people who cried for portioning the country on Hindu-Muslim line after the birth of Pakistan had undergone a change in their face and behavior. Now it is time to show responsibility- this is a time for construction. There should not be any more division among the people. Those were the general thinking of the common Muslim mass- as Ila Mitra experienced while still she was just a bride in a traditional Hindu Zemindar family of Rajshahi. An educated and champion athlete of Bangla became captive in a remote village of Rajshahi. She expressed her feelings of those days in the article as: "I can't make any one understand the saddest captivated condition of mine in those days after the marriage. My past life full of youth and reverberation was buried inside the seven segmented self contained zemindar building (Saat Mahal Jamidar Bari). Mother in law of Ila Mitra decided to stay back in Pakistan. She was not afraid to live in Pakistan as most Hindus were at that time. She declared, as reported by her daughter in law that " we spend our whole life with Muslims, except them no one is coming within our estate - why should then the family migrate to India? She posed a question. This one sentence of her, said Ila Mitra, made us Pakistani citizens. No member of the family raised any objection.

She recalled the 14th August of 1947. When the zemindar family decided to stay in Pakistan the common mass rejoiced. On the day a big assembly was held- no one had seen such a big mass meeting ever before in that remote village. Ramen Mitra was given the responsibility of hoisting the national flag of Pakistan. She recalled the day in this manner : ... In the assembly my

husband Ramen Mitra got the rare opportunity of raising the Pakistani flag. The animosity against Hindus sublimed in the air like piece camphor. .. this is not the story of a family. At that time my mother-in-law's thought was that if stayed back, thousand of families of Hindus and Muslims equally, would have courage and feel secured. .... Now this is the time to build Pakistan with hand in hand. This was the sentiment of the common people at that time. She recalled her most fruitful days of her life there : .... Then within only two years I was swayed away at the overwhelming sentiments, violent exuberance, intense activism and waves of exultation of the minds of the people of East Bangla; when the boundary walls of the zemindari house had been withered away; I didn't know; I was liberated; I became a worker of the peasant movement and then finally I was thrown into the darkness Pakistani prison as I was considered to be an obstacle .to the aspiration of the Pakistani rulers. After more than one and half decades days of the past flashed in my mind as scenes of a motion picture with a romantic feeling even to me.

Comrade Ila Mitra began her public life in the village female education. A school was opened not far from her house. She launched a movement urging the girls of the locality to take education seriously. She in fact started teaching the girls at the school. Within a year the movement became very popular. Hundreds of girls and adult women joined schools. Many schools were opened at different villages. The Muslim social leaders that included Maulavis, Mullahs, and elites of the Muslim class no more took this movement as some sort of fancy or play of the daughter in law of the zemindar family. They objected girls attending school as according to their interpretation of Islam. It is against Shariah.

Ila Mitra later remembered those days in this fashion in her article: The Muslim society became divided in two groups opposing each other on the issue of girls coming to school. ... they (elite class) launched, quoting from Shariat, a campaign against the exposed and sinful' education (be-parda mlechha shiksha). Against them the common villagers took a stand in bigger assembly. Those so called illiterate poor villagers

shattered the arguments against female education put forward by the rich and elite class with such counterarguments that had no parallel. Here is an example. The landless, poor and himself an illiterate- the agriculture-labourer (Kshet Majur) Wazed Marol in an inspiring speech in an assembly of people debating on the issue of Girls' School said: " That Amina Bibi is working as maidservant in the agricultural farm of Sahibs of Mian Para. Isn't she a Muslim woman? Are the Muslims girls who fetch water from the river to the harem for the wives of the Sahibs untouchables to Allah ?

It is quite apparent from her writings that although physically she was absent from East Bangla, she had participated in all progressive movements mentally as well as spiritually. In some place of the article she wrote: People of East Bangla are still fighting. There is however no alternative- and fighting is never a bed of roses. In those days I was with them, am I not with them even today? It is a misfortune that to day I am here. .....

In fact to repay my debt of my freedom, it is imperative that I must fight to earn the friendship of people of Pakistan. These people had in the past twice earned my freedom once from the captivity of my in-laws' house and second time from the Pakistani jail. Could I stay behind at this hour of their liberation movement?

Am I that ungrateful?

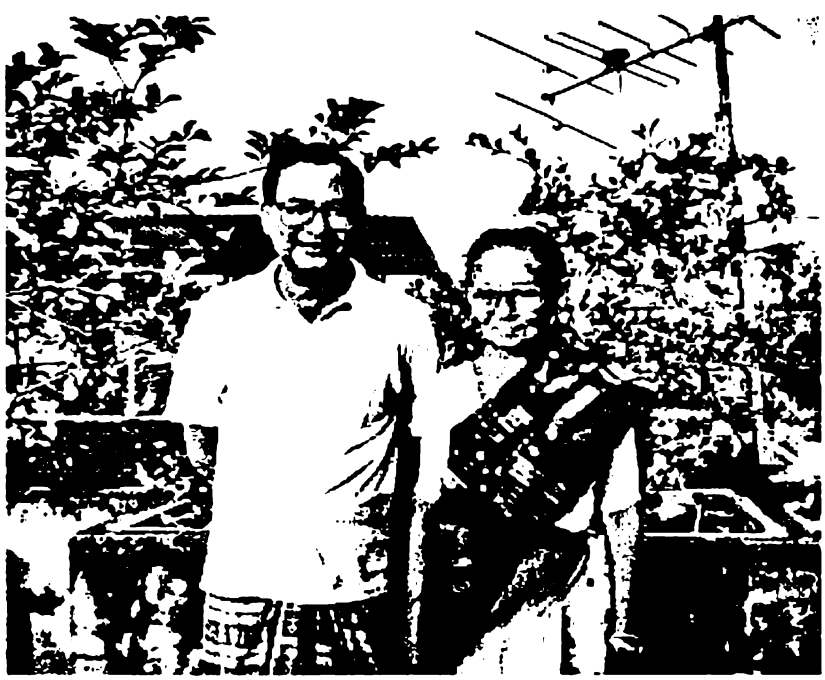

বিপ্লবী ইলা মিত্র ও কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

বিপ্লবী ইলা মিত্র ও রমেন মিত্র

বিপ্লবী ইলা মিত্র ও সুফিয়া কামাল